মুসলিম বাংলার মনীষা

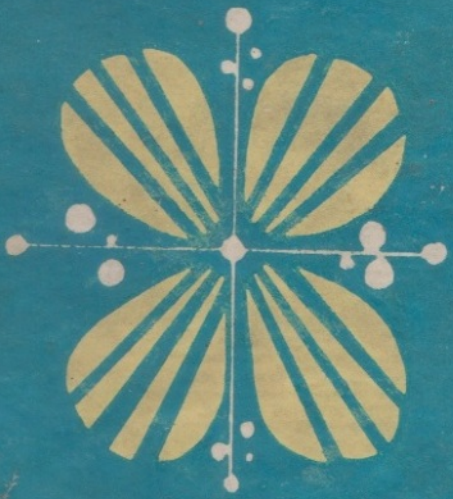

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী

মুসলিম বাংলার মনীষা

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

হিজরী পঞ্চদশ শতককে স্বাগত জ্ঞাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

www.pathagar.com

মুসলিম বাংলার মনীষা :
মোহাম্মদ আলী চৌধুরী

ই. ফা. প্রকাশনা : ৮০৪

দ্বিতীয় সংস্করণ :
সেপ্টেম্বর, ১৯৮০
ভাদ্র, ১৩৮৭
শাওয়াল, ১৪০০

প্রকাশনায় :
হাফেজ মঈনুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৬৭, পুরানা পল্টন
ঢাকা—২

প্রচ্ছদ অংকনে :
এম. এ. আহ্‌মেদ

মুদ্রণে :
মীরকো প্রেস
৫৪, নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা—১

বাঁধাইয়ে :
জি. এম. বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৯, পাটুয়াটুলী লেন
ঢাকা—১

মূল্য : ৮·০০ টাকা

MUSLIM BANGLAR MONEESHA : The Intellect of Muslim Bengal, written by Muhammad Ali Chowdhury in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dacca to welcome the commencement of the 15th century Al-Hijra.

Price : Tk. 8·00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার স্নেহসুধাসিক্ত মনের চিরন্তন
'কাজলা দিদি'
রওশন আরা আপাকে—
দুই দশক পূর্বে কুমারী জীবনেই
যিনি পাড়ি জমিয়েছিলেন
মৃত্যুলোকের কোন্ অচিনপুরে।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মুসলমান জাতির গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্যকে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে মুসলিম জগতের কীর্তিমান পুরুষদের জীবন-বৃত্তান্তমূলক পুস্তক প্রকাশের এক ব্যাপক কর্মসূচী ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে। বর্তমান গ্রন্থ তারই অন্যতম ফলশ্রুতি।

পলাশীর যুদ্ধে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুতির পর শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি অর্থাৎ তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এক দিগন্ত প্রসারী অবক্ষয় ও অধঃপতনের সূত্রপাত ঘটে। জাতির শতাব্দীব্যাপী এই দুর্দশা মোচনের উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে সৈয়দ আমীর আলী, কায়কোবাদ, রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রমুখ মনীষী এগিয়ে এলেন দুর্জয় সংকল্প নিয়ে। তাঁদেরই মিলিত প্রচেষ্টা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার বিনিময়ে মুসলিম সমাজে জাগরণের জোয়ার আসে। এই রেনেসাঁ আন্দোলনেরই ফসল আজকের বাংলার মুসলমান সমাজ, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে যাঁরা জাগরণের অগ্রদূত ও মশালবাহী-রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের জীবন-বৃত্তান্ত লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সংগে উপস্থাপিত করেছেন। নিছক জীবনকথা বর্ণনা নয় বরং সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলার মুসলিম মনীষীদের অবদান ও কার্যকলাপ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয়েছে এ পুস্তকে। ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবন করেই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক ছাড়াও সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণের শিক্ষক-শিক্ষার্থিগণ গ্রন্থটি পাঠে উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি।

www.pathagar.com

প্রসংগ-কথা

ঐতিহ্য-বিস্মৃত জাতি মাত্রই আত্মবিস্মৃত। যে জাতি তার অতীত দিনের কাণ্ডারীদের ভুলেছে, সে জাতি একাধারে অতীতের প্রেরণা, বর্তমানের সৃজনশীলতা ও ভবিষ্যতের দ্বারকে করেছে রুদ্ধ। কেননা আত্ম-পরিচয়হারা জাতি ভাসমান উদ্ভিদের মতোই স্থিতিহীন।

অথচ বাংলার মুসলিম রেনেসাঁর যাঁরা অগ্রদূত, ঊনবিংশ শতকের সেই দিগন্তপ্রসারী পরাধীনতা, গোঁড়ামী ও সার্বিক অধঃপতনের যুগে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনাবলে যাঁরা রাহুগ্রস্ত জাতির ভাগ্যাকাশে আলোর দীপালী জ্বালাবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও স্বাধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সোপান রচনা করে গেলেন, তাঁদের অনেকেরই স্মৃতি আজ বিস্মৃতির কাফনে ঢাকা পড়ে গেছে। দু'একজন যদিও বা এখনও নামসর্বস্বরূপে মানুষের স্মৃতিপটে প্রদীপের মতো টিম্‌টিম্ করে জ্বলছেন, তবু তাঁদের কীর্তি ও অবদান আমাদের অনেকেরই নিকট সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

কায়কোবাদ, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী প্রমুখ না এলে নজরুল, শেরেবাংলা প্রমুখের আবির্ভাব হতো কিনা সন্দেহ।

এঁদের প্রত্যেকেই আমাদের জাতীয় জীবনের এক-একটি আলোক-স্তম্ভ এবং স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার ভিত্তি রচনাকারী। হিন্দু সমাজে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম প্রমুখের যে আসন, বাংলার মুসলিম রেনেসাঁর ক্ষেত্রে এঁরা অনেকটা সে আসনের যোগ্য দাবীদার।

জাতীয় জীবনের শিরা-উপশিরায় ফল্গুধারার মতো যাঁদের অবদান নিঃশব্দে প্রবহমান, তাঁদের প্রতি অবহেলা তাঁদের ঋণেরই অস্বীকৃতি।

www.pathagar.com

আমাদের জাতীয় স্বার্থেই এ সকল যুগন্ধর পুরুষদের কার্যকলাপ ও অবদান ব্যাপকভাবে আলোচিত ও প্রচারিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কেননা তাঁদের অনুপ্রেরণা আমাদের ভবিষ্যতের দিশা ও আলোক-বর্তিকাস্বরূপ।

সেজন্যেই গ্রন্থে উল্লেখিত মনীষীদের আদর্শ জীবনী লিপিবদ্ধ করতে আমি উদ্যোগী হয়েছিলাম। তারই ফসল এই গ্রন্থ। বলাবাহুল্য এ আমার অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য প্রয়াস মাত্র।

প্রথম সংস্করণের সীমাহীন মুদ্রণ-প্রমাদ যতটুকু সম্ভব সংশোধন করা হলো। তবু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহের জন্যে পাঠকের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

—লেখক

www.pathagar.com

সূচী

কায়কোবাদ / এক
সাংবাদিক মৌলবী মুজীবুর রহমান / সতের
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ / পঁচিশ
মীর মোশাররফ হোসেন / ছত্রিশ
সৈয়দ আমীর আলী / আটচল্লিশ
মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ / উনষাট
মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন / সত্তর
মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ / উনআশি
কবি দাদ আলী / নব্বই
বেগম রোকেয়া / একশত তিন

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

তারিখ ই- শেরশাহী (অনুবাদ)

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব (যন্ত্রস্থ)

www.pathagar.com

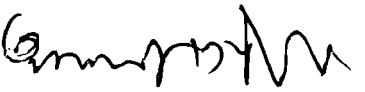

www.pathagar.com

কায়কোবাদ

পলাশীর আম্রকাননে বাংলার মুসলমান তথা ভারতের মুসলমান শুধু স্বাধীনতা হারায়নি, সেই সংগে হারিয়েছিল আত্মশক্তি, আত্ম-পরিচয়ও। পরাধীনতার পীড়নের চাপে মুসলমানদের উন্নত শির নুইয়ে পড়ল। কৃষ্টি, সাহিত্যের উপর চতুর্দিক থেকে আসতে থাকে মরণাঘাত। তাকে প্রতিহত করার মনোবল মুসলমানেরা হারিয়ে ফেলেছিল। মূর্ছাহত রোগীর মত সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাজ গিয়েছে, এবার শিরও বুঝি যায়। মুসলমানদের হাত থেকে বিদেশী বেনিয়া তখ্‌ত কেড়ে নিয়েছে। বিজিতের টুটি চেপে ধরেছে বিজেতা। তাই সিপাহী বিদ্রোহের পরে দেখতে পাই ইংরেজের নিষ্ঠুর হস্তের মারণ যজ্ঞে মুসলমানদের বলি হতে। দিনের পর দিন বাঙালী মুসলমানদের অবস্থা হয়ে পড়ল শোচনীয়। রাহুগ্রস্ত জাতির এই চরম দুর্দিনে সাহিত্যের মজ্জমান তরুণীতে যাঁরা শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন, মহাকবি কায়কোবাদের স্থান তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রথম সারিতে।

কায়কোবাদ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত, তখন বাংলার হিন্দু সাহিত্যিকেরা অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। মুসলিম রচিত সাহিত্য তখন অস্বীকৃত, অবহেলিত ও অপমানিত। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ হিন্দু মনীষীরা এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন: "এসব আগাছা সাহিত্যের উদ্যান হতে কে'টে ফেলাই উচিত।"

মুসলমানদের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে কায়কোবাদ বলে-ছিলেন: "সে আজ বহুদিনের কথা—সপ্ততি বৎসরের কম নহে, আমি যে কালে প্রথম বাংলা ভাষার চর্চা আরম্ভ করি, সে কালে আমরা চারিজন ব্যতীত অন্য কোন মুসলমান লেখক ছিলেন না। এঁদের একজন কুষ্টিয়ার লাহিড়ীপাড়ার মীর মোশাররফ হোসেন ও অন্যজন পরানের পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন। তাঁহাদের দুইজনেই গদ্য লেখক মাত্র। আমি কবিতা

www.pathagar.com

লিখিতাম। ইহার কিছুকাল পরেই শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক আমাদের সংগে মিলিত হন।"

তৎকালে মুসলমান সাহিত্যিকদের প্রতি হিন্দুদের মনোভাব সম্বন্ধে কবি লিখেছেন :

"সেকালে হিন্দু লেখকগণ আমাদিগকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখতেন, তাঁরা বলতেন, মুসলমানেরা বাংলা লিখতে জানে না। এসব শুনে আমাদের মনে বড়ই আঘাত লাগত। বলতে কি, ঐসব শ্লেষোক্তি আমার হৃদয়ে বিষম পীড়া দিত।" তিনি আরও বলেছেন : "মুসলমান জাতিকে লক্ষ্য ক'রে এসব কটূক্তি করাতে বড়ই মর্মাহত হয়েছিলাম। বলতে কি! ওরা কোন বহি হাতে নিয়ে মুসলমান গ্রন্থকারের নাম দেখলেই ফেলে দিত।"

কিন্তু এতখানি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কবি হতাশ হননি। স্বজাতিপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি স্বীয় কর্তব্যপথে অগ্রসর হন। কবি বলেছেন : "আমি এইসব অবমাননার বোঝা মাথায় নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মুসলমান লেখক বাংলা লিখতে জানে কিনা, তাহা হিন্দু ভাইদের দেখাতে হবে।" এতখানি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ছিলেন বলেই আজ তিনি আমাদের গৌরবের পাত্র।

মহাকবি কায়কোবাদ ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা জেলার অন্তর্গত আগলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কায়কোবাদ কবির ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোয়ায়শী, তাঁর পিতার নাম এমদাদ আলী এবং মাতার নাম জরিপউন্নেছা। কবির বংশ-পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হল :

হাফিজ উল্লাহ আল কোরায়শী
এনায়েৎ উল্লাহ আল কোরায়শী
নেয়ামত উল্লাহ আল কোরায়শী
মোহাম্মদ কাজেম আল কোরায়শী (কবি)

www.pathagar.com

কায়কোবাদের পূর্বপুরুষ বাগদাদ থেকে ভাগ্যান্বেষণে দিল্লীতে উপনীত হন। সেখান থেকে বাংলাদেশে পাড়ি জমান। তাঁরা প্রত্যেকে চরিত্র-মাধুর্য ও পাণ্ডিত্যে ছিলেন অতুলনীয়। কায়কোবাদের পিতাও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন।

কায়কোবাদের প্রাথমিক শিক্ষা ঢাকা মাদ্রাসায় শুরু হয়। তৎপর তিনি বিদ্যাশিক্ষার মানসে কলকাতা গমন করেন। কিন্তু নানা কারণে কবির পাঠ্যজীবন দীর্ঘায়িত হতে পারেনি। কবি ১৯ বছর বয়সে পিতামাতাকে চিরদিনের জন্য হারান।

আত্মীয়-স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি সম্পত্তিচ্যুত হয়ে আর্থিক সংকটে পতিত হন। অন্নসংস্থানের অন্য কোন উপায় না থাকায় তিনি স্বগ্রামে সামান্য বেতনে পোস্টমাস্টারের চাকরি গ্রহণ করেন। সারাজীবন কবির অভাব-অনটনের মধ্যে কাটে। কিন্তু সাহিত্যের টানে তিনি সকল অভাব-অনটনের যন্ত্রণা ভুলে যেতেন। সাহিত্য-জীবনে কায়কোবাদ কবি নবীনচন্দ্র সেনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ক্ষেত্রবিশেষে ভক্তির আতিশয্য-বশত তিনি নবীন সেনের সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করেছেন। নবীন সেন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "কিন্তু নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য ব্যতীত অমিত ছন্দের সেই আবেগময়ী ওজস্বিতা তটিনীর ন্যায় সেই তরঙ্গায়িত কল-কলায়িত অথচ জীবন্ত মধুরতা কয়জন কবির কাব্যে আছে। নবীন সেনের লেখা যেমন মার্জিত তেমনি মধুর তেমনি গভীর ভাবপূর্ণ। তাঁহার ভাষার সহিত অন্যান্য কবির ভাষার তুলনাই হয় না। ..... নবীন সেনের উপযুক্ত আদর আজ পর্যন্ত হয় নাই। আমাদের ভাবী বংশধরগণ বোধ হয় একদিন তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। আমার বিশ্বাস সেদিন আধুনিক প্রসিদ্ধ কবিদের জ্যোতি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। জানি না সেদিন কবে আসিবে।"

কায়কোবাদ ব্যক্তিগত জীবনে অতিশয় সাদাসিধা ও ধর্মানুরাগী ছিলেন। তিনি নিরিবিলি জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। সত্য প্রকাশে তিনি কখনো কুণ্ঠিত ছিলেন

www.pathagar.com

না। তিনি বলেছেন, "আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেও উচিত কথা বলিতে আমি একটুও সংকোচ বোধ করি না। কেননা কর্তব্য আমার নিকটে সবচেয়ে বড়।"

পরিণত বয়সে কবি তাঁর সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তিনি কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' সম্মেলনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

জীবন সায়াহ্নে কবি তাঁর সমস্ত গ্রন্থ সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হবিবে আলমের হস্তে অর্পণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি যে দলিলখানি রচনা করেন তা নিম্নরূপ :

"আমার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হবিবে আলমকে আমার সমস্ত পুস্তকের Managing proprietor এবং Sole Agent নিযুক্ত করিলাম। আমার জীবিতাবস্থায় অথবা আমার মৃত্যুর পর আমার রচিত সমস্ত বই মুদ্রণ এবং পরিচালনার ভার তাহার উপরই ন্যস্ত করিলাম। আমার বা আমার স্ত্রী তাহেরুন্নেছা খাতুনের অন্য কোন ওয়ারিশ ইহার মধ্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। আমার ও আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমার রচিত সমস্ত বইগুলির প্রকাশের ভার আমার পুত্র হবিবে আলমের উপরই ন্যস্ত করিলাম। আমার অন্য কোন ওয়ারিশান আমার ও আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর উক্ত বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কেহ করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে। Managing Proprietor ও Sole Agent হবিবে আলমের দস্তখত ব্যতীত কোন বই বাজারে বিক্রয় হইলে তাহা জাল বলিয়া প্রমাণিত হইবে এবং আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে।

ইতি—

তাং বাং ২৭ শা আশ্বিন, ১৩৬৫ সন

বিনীত

কায়কোবাদ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

www.pathagar.com

কবির অন্যান্য পুত্রকন্যা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের হস্তে সকল গ্রন্থস্বত্ব অর্পণ করলেন, তার কারণ এখনও জানা যায়নি।

দীর্ঘ দিন বাংলা ভাষার সেবায় নিয়োজিত থাকার পর মহাকবি কায়কোবাদ ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে ২১ শে জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি সমাধির স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ করার জন্য নিম্নলিখিত স্মৃতিলিপিটি রচনা করেন ঃ

কায়কোবাদের জন্মভূমি
আগলা পূর্ব পাড়া।
ইছামতী নদীর তীরে
সকল গ্রামের সেরা।
পিতা তাহার এমদাদ আলী
জরিফউন্নেছা মাতা।
নোড়াইল তাহার পৈতৃক ধাম,
তাহার জন্ম হেথা।
তাহেরউন্নেছা পত্নী তাহার
শুয়ে আছে পাশে।
শোভিত সমাধি যাহার
শ্যাম-বর্ণ ঘাসে।
কে যাও পথিক ? দাঁড়িয়ে কিছু
কর আশীর্বাদ।
ঘুমিয়ে রয়েছে হেথা
কবি কায়কোবাদ।

কবির এ রচনা মাইকেলের 'দাঁড়াও পথিক বর' সমাধিলিপির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

কায়কোবাদ সারাজীবন সাহিত্য-সেবা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। গ্রন্থগুলো সাহিত্যচর্চায় বাঙালী মুসলমানদের অনুপ্রাণিত ও পথনির্দেশ করেছিল। এ অনুপ্রেরণা মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনীহা এবং অজ্ঞতা বিতাড়নেও সহায়তা করেছে বিপুলভাবে।

প্রথমেই কবির মহাকাব্য আলোচনায় আসা যায়। কেননা মহাকাব্য রচনার জন্যই তাঁর নামের সংগে মহাকবি বিশ্লেষণ সংযোজিত হয়েছে। কবি তিনটি মহাকাব্য রচনা করেছেন—'মহাশ্মশান' 'শিবমন্দির' বা 'জীবন্ত সমাধি' এবং 'মহরম শরীফ' বা 'আত্মবিসর্জন' কাব্য।

'মহাশ্মশান' কবির সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মহাকাব্যখানি রচিত। এ গ্রন্থের রচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন ঃ

"আমি বহুদিন যাবৎ মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য সম্বলিত এমন একটি যুদ্ধ-কাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন যে, এক সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন। তাঁহারা অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীন বীর্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না।"

মহাকাব্য হিসেবে 'মহাশ্মশান' কতখানি সার্থক হয়েছে, সে বিষয়ে বিতর্কের সুযোগ থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। মহাকাব্যে এমন একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকে যাকে ঘিরে সমগ্র ঘটনা প্রবাহ আলোড়িত ও আবর্তিত হয়। 'মহাশ্মশান'-এর কেন্দ্রীয় পুরুষ সে হিসেবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তবে সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটিতে মহাকাব্যের মান অক্ষুণ্ন রয়েছে। সাহিত্যিক ও সমালোচক আবুল ফজল বলেছেন ঃ "শত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'মহাশ্মশান' শুধু কবি কায়কোবাদের যে শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম তা নয়; বাংলা সাহিত্যেরও এটি একটি বিশেষ কীর্তিস্তম্ভ। 'মহাশ্মশান'কে বাদ দিয়া বাংলা সাহিত্যের কোন ইতিহাস বা আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না।"

www.pathagar.com

নিম্নে 'মহাশ্মশান'-এর বিভিন্ন সর্গ থেকে কিছু অংশ চয়ন করা গেল :

(ক) এ কোন অমরাবতী কহলো কল্পনে,
সুধামুখী, কহ শুনি এ কার উদ্যান
মর্ত্যভূমে ? ত্রিদিবের নন্দন কানন
নহে সমতুল ! দেবী কোন ভাগ্যবান
গড়িয়েছে এ উদ্যান এত সুশ্রী করি,
এই স্থানে ? অই দেখ নয়ন রঞ্জন
কত পুষ্পতরু, কত কুসুম পল্লবী
শোভিতেছে শ্রেণীমত তরু সাথে বসি।
কত জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী মনোহর
আলাপিছে সুধারবে সঙ্গীত মাধুরী !

(সেতারা : রাজ্যোদ্যান : প্রথম বর্ষ)

(খ) ...এ কোন নগর দেবী ? ফতেপুর শিক্রি...
যাহার সুরম্য দেহ অসংখ্য রতনে
করেছে সজ্জিত সেই সম্রাট প্রধান
আকবর ! হায় দেবী, এই যে নগরী
ফতেপুর শিক্রি একটি ভগ্নবাড়ী।

(গ) 'দ্রুম' 'দ্রুম' কি ভীষণ প্রলয়ের ধ্বনি
উঠিল সহসা নৈশ, কাঁপায়ে মেদিনী,
ছুটিল কাননে পশু, নীড়ে বিহঙ্গম
কূজিল সভয়ে স্বর্গে, কাঁপিল অমর।

(কুঞ্জপুর দুর্গ যুদ্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড, দশম সর্গ)

(ঘ) ...হেথা মনুষ্য বসতি
নাহি এবে, স্থানে স্থানে ইষ্টকের স্তূপ ;
উন্মাদিনী বেশে হায় এ দিল্লী নগরী
মুসলমান গৌরবের চিতা ভস্মরাশি

www.pathagar.com

মাখি হৃদে, অবিরত কাঁদিছে নীরবে
... ...

ভগ্নকূপ, ভগ্নদুর্গ, ভগ্ন অট্টালিকা
রাশি রাশি, কোথাও বা ভগ্ন পাঠাগার,
মসজিদ মিনার ভগ্ন, ভগ্ন দেবগৃহ
ভগ্ন স্থানাগার, ভগ্ন চিকিৎসালয়,
কোথাও অর্ধভগ্ন সমাধিমন্দির।"

(পুরাতন দিল্লী কুতুব মিনার দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সর্গ)

(ঙ) আয় মুসলমান শিয়াসুন্নী মোগল পাঠান একসাথে।
ইসলাম ধর্মের ডাক পড়েছে যুদ্ধ আজি পানিপথে।
ইসলাম সাথে হিন্দু ধর্মের বেধে গেছে ভীষণ রণ।
হিন্দুত্বের প্রাণ সংহারিতে ইসলামের আজ জীবন পণ।
এগুয়ে পড় এগুয়ে পড় যে আছ ঐ সাথে সাথে
আজ যে তাহার বল পরীক্ষা হবে রে ঐ পানিপথে।

(পানিপথ যুদ্ধক্ষেত্র, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সর্গ)

সমগ্র মহাকাব্যখানিতে কবি কোথাও অধপতিত মুসলমানদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেছেন, কোথাও বা মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করে গর্বে ফুলে উঠেছেন। বস্তুত 'মহাশ্মশান' কবির স্বধর্ম ও স্বজাতি প্রীতির এক সমুজ্জল নিদর্শন।

কবির অন্যতম মহাকাব্য 'শিবমন্দির'। গ্রন্থটি ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে (বাংলা সাল ১৩২৮) প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত ব'লে কবি উল্লেখ করেছেন। কাব্যের মর্মবাণী সম্পর্কে কবি বলেছেন: "প্রেমেই মুক্তি, এই প্রেমই 'শিবমন্দির'-এর ভিত্তি। এই কাব্যখানিতে আমি পাপপুণ্যে সংঘর্ষ দেখাইয়া পাপের পতন দেখাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা পাঠকদের বিবেচনা সাপেক্ষ।"

www.pathagar.com

নমি আমি তব পদে হে দিন শরণ
দয়া কর এ অকৃত অধম সন্তানে।

এ প্রার্থনার মাধ্যমেই কবি 'শিবমন্দির' রচনা শুরু করেন। কবির স্ত্রী তাহেরউন্নেছা খাতুনের নামে কাব্যখানি উৎসর্গকৃত। 'শিবমন্দির' তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড বা উদ্যোগ পর্ব ত্রয়োদশ সর্গে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা :

মায়াতে আবদ্ধ, কাম ক্রোধ লোভ লয়ে
ছুটিয়া বেড়ায় সে যে রুদ্ধ অবনীতে।

দ্বিতীয় খণ্ড বা অনুষ্ঠান পর্ব পঞ্চম সর্গে বিভক্ত। নিম্নোক্ত ভূমিকা দিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ করা হয় :

এ সংসার কর্মভূমি।
কি বীজ বুনেছ তুমি ;
পশ্চাতে ফিরিয়া দেখ
কি চিহ্ন রাখিয়া যাও।

তৃতীয় বা প্রায়শ্চিত্ত পর্ব পঞ্চম সর্গে বিভক্ত। তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা নিম্নে প্রদত্ত হল :

এ সংসার কর্মভূমি, যে বীজ রোপিবে,
ফল তার অনুরূপ লভিবে নিশ্চয়।
সে যে স্ব স্ব কর্মফল অবশ্য বুঝিবে,
অদৃষ্ট তাহারি নাম ; অন্য কিছু নয়।

'শিবমন্দির' কাব্যটি বিয়োগান্ত। চরিত্র সৃষ্টির চেয়ে নিছক বর্ণনাই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। 'মহাশ্মশান' অপেক্ষা 'শিবমন্দির' অনেক দুর্বল।

কবির 'মহরম শরীফ' বা 'আত্মবিসর্জন' প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে। সুবিখ্যাত কারবালা যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনার বাস্তব বর্ণনা কাব্যখানির মূল উপপাদ্য। কিন্তু নিছক ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা

www.pathagar.com

দিয়ে মহাকাব্য রচনা করলে তাতে কাব্যগুণ ব্যাহত হতে বাধ্য। কাব্য ইতিহাস নয়; ইতিহাসের কংকালের উপর কল্পনার দেহবল্লরী রচনা করে মহাকাব্যের সৃষ্টি। উক্ত কাব্যে ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গিয়ে কবি কাব্যটিকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। মাইকেল যে রামায়ণের কাহিনী নিয়ে সার্থক মহাকাব্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন কারবালা কাহিনী তার চেয়ে কোন অংশে দুর্বল নয় বরং উৎকৃষ্ট। কিন্তু কবি কাব্য-খানিকে একটি ঐতিহাসিক ধারাবিবরণীতে পরিণত করেছেন।

'মহরম শরীফ'-এর প্রারম্ভিক বাণী-বন্দনা নিম্নরূপ :

ভেঙে গেছে বীণা মোর ছিঁড়ে গেছে তার,
কেমনে গাইব আমি 'আত্মবিসর্জন'
এস গো কল্পনা দেবী হৃদয়ে আমার
সুর দাও বীণা মোর ভগ্ন পুরাতন।
গাইব সে শোকগাঁথা আমি অশ্রুধারে
ত্রিদিবের পারিজাত পড়িবে ঝরিয়া।

'মহরম শরীফ'-এর ভাষা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল এবং সুমধুর। সর্বোপরি এতে কবির স্বাবলম্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এর জন্য কবি প্রশংসার যোগ্য। এতদ্ব্যতীত কায়কোবাদ 'অশ্রুমালা' 'অমিয়ধারা' 'শ্মশানভস্ম' 'প্রেমের ফুল' 'প্রেমের রাণী' 'প্রেম পারিজাত' 'মন্দাকিনী ধারা' 'গাওস পাকের প্রেমের কুঞ্জকুসুম কানন' 'বিরহ-বিলাস' 'জাতীয় সংগীত' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে 'অশ্রুমালা' ও 'অমিয়ধারা' কাব্য দুটিই প্রধান।

'অশ্রুমালা' ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। উক্ত কাব্যে ৯৩ খানি কবিতা স্থান লাভ করেছে। অধিকাংশ কবিতাই প্রেম-বিরহমূলক। উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছেন :

প্রিয়তমা

আজ অনেক দিনের সেই অশ্রুজল ও দীর্ঘ নিশ্বাসগুলি একত্র করিয়া একছড়া মালা গাঁথিয়াছি। বড় আশা তোমাকে পরাইয়া গত জীবনের

www.pathagar.com

সমুদয় দুঃখ, সমুদয় যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইব—আমার মনের সেই সমুদয় ক্ষোভ, সমুদয় সাধ মিটাইয়া আমার এই অতি যত্নের 'অশ্রুমালা'টি তোমাকে পাঠাইয়াছি। ইহাই আমার প্রেম, ইহাই আমার ভালবাসা, ইহাই মরুময় জীবনের একমাত্র শান্তি-প্রস্রবণ। তুমি সুখে থাক, আমি বিদায় হই। তোমার সেই 'কোবাদ'

'অশ্রুমালা' কাব্যখানি সকলের প্রশংসা ও সমাদর লাভ করেছিল। নবীন সেন বলেছেন: "অল্প শিক্ষিত হিন্দুরই বাংলা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে। 'ঢাকা গেজেট' সম্পাদক লিখেছেন: "আমরা পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পড়িয়া এতদূর তৃপ্তি লাভ করিয়াছি যে, শতমুখে গ্রন্থকারের প্রশংসা না করিয়া পারি নাই। কবি কায়কোবাদের অশ্রুজল অত্যন্ত উত্তপ্ত, প্রতি বিন্দুতেই শোকোচ্ছ্বাস দেদীপ্যমান।" সারস্বত পত্রের সম্পাদক লিখেছেন: "কবি 'অশ্রুমালা'য় প্রধানরূপে সেই প্রেমের গীতিই গাহিয়াছেন। সুতরাং এ গীত যেমন একদিকে তাঁহার প্রিয়তমার যোগ্য উপহার অন্যদিকে প্রেমোপাসক মানব হৃদয় মাত্রের বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি।" এ কাব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি নিজেই লিখেছেন: "কবিতার প্রধান উপাদানই প্রেম, যে কবিতায় প্রেমের গৌরব নাই সে কবিতা কবিতাই নহে। —প্রেমের অর্থ নিঃস্বার্থপরতা —নিজেকে অপরের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া অর্থাৎ আমিত্বকে লোপ করিয়া সেই আমিত্বকে তুমিত্বের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া, ইহারই নাম প্রেম। এই 'অশ্রুমালা'র প্রধান উপাদানই সেই প্রেম। সুতরাং ইহার নাম 'অশ্রুমালা' না হইয়া 'প্রেমাশ্রুমালা' হইলেই বুঝি ঠিক হইত।"

ভাষার সৌন্দর্যে, বিষয়বস্তুর বর্ণনায় ও পরিবেশনের বৈচিত্র্যে 'অশ্রু-মালা' নিঃসন্দেহে একটি উপাদেয় কাব্য।

১৩২৯ সনের ১লা ফাল্গুন 'অমিয়ধারা' ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত। কাব্যটি তাহেরউন্নেছা খাতুনের নামে উৎসর্গ

www.pathagar.com

করা হয়েছে। উক্ত কাব্যের প্রথম খণ্ডে ১০৫টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ১১টি এবং তৃতীয় খণ্ডে ৬টি কবিতা স্থান লাভ করেছে।

কাব্য বিচারের দিক থেকে 'অমিয়ধারা'কে 'অশ্রুমালা' থেকে খুব একটা পৃথক ভাবা যায় না। বিচিত্র ভাবনা সমন্বিত খণ্ড খণ্ড কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। এর দু'একটি কবিতা অত্যন্ত মধুর যেমন :

কে অই শুনালো মোরে আজানের ধ্বনি!
মর্মে মর্মে সেই সুর, বাজিল কি সুমধুর,
আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী!
কি মধুর আজানের ধ্বনি!

কবিতাটি পাঠ করিলে আযানের সমস্ত মাধুর্যটি এক অনির্বচনীয় রসে হৃদয়ের মধ্যে তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। কবি 'ফুলের হাসি' কবিতায় লিখেছেন :

কেন রে আজ কুসুমকলি
হাসিল এত হাসি
কাল যে রে তুই ঝরে গিয়ে
হয়ে যাবি বাসি।

অন্য এক কবিতার নমুনা :

বাংলা আমার, আমি বাংলার
বাংলা আমার জন্মভূমি।

মনের বিচিত্র ভাষারাশি সমন্বিত এ কাব্যখানি পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছে। 'অমিয়ধারা' প্রকাশক বলেছেন : "উষার সেতারের ললিত রাগিনী বন্ধ হইয়া গেলেও তাহার শেষ ঝঙ্কারটুকু যেমন শ্রোতার কানের মাঝে আবদ্ধ থাকিয়া প্রাণে আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়, তদ্রূপ পাঠান্তে ইহার মধুরতাটুকুও পাঠককে ক্ষণকালের জন্য পার্থিব চিন্তা হইতে বিরত রাখিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।"

www.pathagar.com

এখন কায়কোবাদের সাহিত্য-মানস সম্পর্কে কিছু বলা যাক। বস্তুত কায়কোবাদের সাহিত্য ছিল আদর্শভিত্তিক। আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে কবি তাঁর সাহিত্যের পরিমণ্ডল রচনা করেছেন, এই আদর্শের খাতিরে তিনি তাঁর সাহিত্যরস ক্ষুণ্ণ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। যেমন তাঁর 'মহরম শরীফ' কাব্য।

কায়কোবাদ মুসলমান। নিছক জন্মসূত্রে পাওয়া এ মুসলমানিত্ব নয়। তিনি মনে-প্রাণে এবং পোশাকে-পরিচ্ছদেও খাঁটি মুসলমান। মুসলমান হওয়ার জন্য তিনি গর্বিত। তাই তিনি বলেছেন: "ধর্মের চেয়ে বড় এ জগতে কিছু নেই।"

মুসলমানদের গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত। আবার তাদের পতনে অশ্রু ভারাক্রান্ত। শুধু অশ্রু বিসর্জন করে ক্ষান্ত হন নাই। সম্বিতহারা মুসলমান জাতিকে তাঁর অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে ভবিষ্যতের দিকে আকুলভাবে আহ্বান করেছেন:

আর কত ঘুমাবি—ওঠ ওরে মুসলমান,
নাই কি তোদের লজ্জা শরম,
নাই কি তোদের মান।

তিনি একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, স্বাতন্ত্র্য বিলীন করে নয় বরং স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই নিজের জাতির উন্নতির সোপান রচনা করতে হবে। তাই তখন যে সমস্ত মুসলমান সাহিত্যসেবী হিন্দুদের ভাব-ভাষা অনুকরণ করে সাহিত্য-চর্চায় নিরত ছিলেন, তিনি তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। 'বিষাদসিন্ধু'তে আল্লাহর পরিবর্তে ভগবান ইত্যাদি হিন্দুয়ানী শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কবি কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেছিলেন।

কবি লিখেছেন: "অধঃপতিত ও নিদ্রিত জাতিকে জাগাইবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ই সৎসাহিত্য আলোচনা।" তিনি সৎসাহিত্য রচনার সাধনাতেই জীবন অতিবাহিত করেন। সাহিত্যে অশ্লীলতাকে তিনি রীতিমত অপরাধ

www.pathagar.com

বলে মনে করতেন। এই অশ্লীলতার জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও রেহাই দেননি ঃ

"রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখিতে যাইয়া অশ্লীলতার নগ্ন চিত্র আঁকিয়াছিলেন। তাঁই 'ঘরে বাইরে' ও 'নৌকাডুবি' পাঠ করিলে সুধী পাঠক আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এগুলি ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবকদের খুবই মুখরোচক। কেননা ইহারই নাম মনস্তত্ত্ব। পরের স্ত্রীকে লইয়া নিজের স্ত্রীর মত ছয় মাস ঘরকন্না করিয়া প্রেম আদায় করিয়া লইতে পারিলে নব্য যুবকদের মধ্যে অনেকেই সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু চরিত্রবান ধর্মভীরু পাঠকের কাছে এ কার্যগুলি হারাম ও অবৈধ। জানি না এক্ষেত্রে হিন্দু নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ কি ব্যবস্থা দেন।"

অবশ্য 'ঘরে বাইরে' ও 'নৌকাডুবি' অশ্লীল উপন্যাস কিনা তা তর্ক সাপেক্ষ।

কায়কোবাদের পরিণত বয়সে বাংলা সাহিত্য আধুনিক ও প্রাচীন—এ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কায়কোবাদ ছিলেন শেষোক্ত দলে। এ দু'দলের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি ছিল। কায়কোবাদ নবীনপন্থীদের বাজে, হালকা ইত্যাদি অনেক বিশেষণে বিভূষিত করেছেন। কবি লিখেছেন ঃ

"আমি জানি, বঙ্গবাণীর সাহিত্য-মন্দিরে আজকাল অনেক নূতন দল জুটিয়াছেন। আমি সে দলের নহি, আমি পুরাতন দলের লোক। আমাদের দলের নবীনসেন, মধুসূদন, দীনেশ, অক্ষয় বড়াল, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণ চলিয়া গিয়াছেন। আমিও এখন যাওয়ার পথে। নূতন দলের সহিত অনেক বিষয়ে আমাদের মতের মিল নাই।"

শেষ পর্যন্ত দু'দল সমঝোতায় উপস্থিত হতে পারেনি।

স্বজাতি-প্রেম কায়কোবাদের সাহিত্যিক আদর্শের আর একটি প্রধান দিক। বাংলায় অধপতিত মুসলমান সমাজের জন্য তাঁর চিন্তার

www.pathagar.com

অবধি ছিল না। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে মুসলমানগণ হিন্দুদের দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছিল—

কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে পাইনে চাকরি মোরা,
প্রত্যয় না হয় যদি মনে,
একবার দয়া করে বাজার দপ্তর গুলি
দেখ চেয়ে Percentage গুণে।

বস্তুত জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন মন্ত্রীসভা গঠন করে, তখন মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের অবহেলা আকাশচুম্বি হয়ে উঠেছিল। গরু জবাই হল নিষিদ্ধ। 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করা হল। নেহেরু গর্বোদ্যত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন: "ভারতে মাত্র দুটি দল—কংগ্রেস ও ইংরেজ।" সাত কোটি মুসলমানের অস্তিত্বই অস্বীকার করলেন তিনি। হিন্দুদের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অবহেলাই মুসলমানদের পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে—একথা অপ্রিয় হলেও ঐতিহাসিক সত্য। মুসলমানের দেশ এটা নয়, আরবের ধূসর মরুভূমি মুসলমানদের আবাসস্থল, একথা হিন্দুরা প্রকাশ্যে বলে বেড়াত। মসজিদের সামনে বাদ্য বাজাতেও তারা দ্বিধাবোধ করত না। এসব দেখে শুনে সংবেদনশীল কায়কোবাদ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন! তিনি লিখেছেন:

মীর্জাপুর পার্কটারে কোন নীতি অনুষঙ্গ
শ্রদ্ধানন্দ পার্ক করে দিল।

সমগ্র মুসলমান সমাজের ক্ষোভ ও জিজ্ঞাসা কবির এ দুটি ছত্রে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, বাংলার মুসলমান হিন্দুর প্রভাবে ক্রমশঃ স্বকীয় সত্তা হারিয়ে ফেলছে এবং সর্বপ্রকারে নিষ্পেষিত হচ্ছে। এর প্রতিকার তিনি চেয়েছিলেন। অতএব, অন্যায়ের প্রতিরোধ ও সুপ্ত মুসলমানদের জাগরণের বাণী তাঁর কাব্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

www.pathagar.com

একটা জাতি কখনও অন্যের অন্ধ অনুকরণে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। ঘরকে যারা বিদেশ মনে করে এবং বাহিরকে যারা ঘর মনে করে তাদের নিকট আপন পর দুটোই অর্থহীন এবং সমার্থক। তারা পরজীবী, পরগাছার মত স্বকীয়তাহীন। তাই নিজস্ব জাতীয় মৌল সত্তাকে ভিত্তি করে প্রথমে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন এবং তারপর ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানব কল্যাণার্থে সর্বপ্রযত্নে মঙ্গল-হস্ত প্রসারণই প্রকৃত আদর্শবাদী দেশ-প্রেমিকের কর্তব্য—একথা কবি কায়কোবাদ যথার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলার মুসলমান স্বীয় ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করে নিজের ভবিষ্যৎ গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করবে। অন্যের মাঝে বিলীন হলে স্বীয় অস্তিত্বকে বিসর্জন দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অন্যের পায়ে ভর করে কেউ চলতে পারে না কবির এ উপলব্ধি ছিল নিজস্ব বোধি সঞ্জাত এবং সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

তবে কায়কোবাদ মোটেই পরধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন না। নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারকে মর্যাদা এবং স্বীকৃতি প্রদান করাই ছিল মহাকবির মূল আদর্শ। এ আদর্শকে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ও সাহিত্যকর্মে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানেই কবির সার্থকতা।

———

www.pathagar.com

সাংবাদিক মৌলবী মুজীবুর রহমান

রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুতি, শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণের অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সম্প্রদায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে পশ্চাৎপদ হ'য়ে পড়ে। শিক্ষা, দীক্ষা, রাজনীতি এবং সাহিত্যের অংগনে এক স্থবিরতা ও শূন্যতা বিরাজ করতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এহেন পরিস্থিতিতে সংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বাংলার মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়ে। অথচ সংাবাদপত্র সমাজ-জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। জাতীয় জীবনের চাঞ্চল্য, ব্যথা বেদনা, গতিধারা ও চিন্তাশীলতা এরই মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এজন্য সংবাদপত্রকে চতুর্থ-রাষ্ট্র বলা হয়ে থাকে। জনমত সংগঠনে এর অবদান অপরিসীম অথচ উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত সংবাদপত্রের অভাবে তৎকালীন মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগ সর্বসমক্ষে তুলে ধরার ব্যাপারে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ রাষ্ট্রভাষা ইংরেজী এবং শাসকগোষ্ঠী ইংরেজী ভাষাভাষী বিধায় অন্য ভাষায় অভাব অভিযোগ তুলে ধরলে তা সরকারের গোচরীভূত হওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। কাজেই জনসাধারণের সমস্যা সমাধানকল্পে ইংরেজী পত্রিকার প্রচলন করা মুসলমানদের জন্য ছিল অপরিহার্য। এ দুরূহ পথে প্রথম আশার আলো প্রজ্জলিত করলেন একনিষ্ঠ সমাজহিতৈষী সাংবাদিক মৌলবী মুজীবুর রহমান। বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে প্রকাশিত হল প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান'। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। হিন্দু প্রকাশিত প্রথম ইংরেজী পত্রিকার পঞ্চাশ বৎসর পরে মুসলমান প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সাংবাদিকতায় বাংলার মুসলমান হিন্দুদের চেয়ে কতখানি পিছিয়ে পড়েছিল এ দৃষ্টান্ত থেকে তা উপলব্ধি করা যায়।

www.pathagar.com

'দি মুসলমান' পত্রিকা মুজীবুর রহমানের বিরামহীন প্রচেষ্টার ফলেই সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

'দি মুসলমান'-এর প্রথম কয়েকটি সংখ্যা মিঃ আবুল কাসেমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তৎপর প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল মুজীবুর রহমান উক্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'দি মুসলমান' ও মৌলবী মুজীবুর রহমানের নাম অভিন্ন ও সমার্থক হয়ে পড়েছিল।

মুজীবুর রহমান ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত নেহালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মুজীবুর রহমানের পূর্বপুরুষ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম এলাহি বখ্‌শ।

মাত্র এগার বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। তৎপর চাচার গৃহে লালিত-পালিত হন। ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং মেধাবী ছিলেন। ধানকুড়িয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে দশটাকা বৃত্তি নিয়ে তিনি এণ্ট্রান্স পাস করেন। প্রথম বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র হিসাবে তিনি ঐ স্কুলের গৌরব বর্ধন করেন। শিক্ষকমণ্ডলী স্বভাব ও মেধার জন্যে তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

মুজীবুর রহমান উচ্চ শিক্ষার্থে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন অচিরে তাঁকে কলেজ ত্যাগ করতে হয়। এফ. এ. পাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

লেখাপড়া ত্যাগ করার পর তিনি জীবিকা অর্জনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি পেশকারের চাকুরী গ্রহণ করেন। নতুন কর্মক্ষেত্রে এসে 'কোর্টের দেয়ালও পয়সা চায়' এ প্রবাদটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হলেন। তাঁর দুর্নীতিমুক্ত মন এ কলুষিত পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠল। তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দিতে মনস্থ করলেন। অবশেষে চাকুরী ছেড়ে নতুন কর্মক্ষেত্রে নামলেন। স্বাধীন পেশারূপে ব্যবসায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে কলকাতায় পাড়ি জমালেন।

www.pathagar.com

কলকাতার বৌ-বাজারে একটি ছোট মনোহারী দোকান খুললেন। একে তো স্বল্প পুঁজি, তদুপরি বৈষয়িক গুণের অভাবে শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ে সুবিধা হল না।

ছাত্রাবস্থা থেকেই মুজীবুর রহমান অত্যন্ত সমাজ ও রাজনীতি-সচেতন ছিলেন। দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সর্বদা চিন্তা করতেন। লেখাপড়ায় বেশীদূর অগ্রসর হতে সক্ষম না হলেও নিজের চেষ্টায় তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করতেন। ফলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর তাঁর অসাধারণ দখল জন্মে। তৎকালীন জনপ্রিয় পত্রিকা 'দি বেঙ্গলি' তে নিয়মিতভাবে লিখতেন। পত্রিকাখানি সম্পাদনা করতেন তৎকালীন বাংলার মুকুটহীন সম্রাট স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

লেখার মাধ্যমেই সুরেন্দ্রনাথ মুজীবুর রহমানের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। এই উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করে মুজীবুর রহমান সংবাদপত্র সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে মনস্থ করেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই তিনি সমাজ সেবার প্রয়াস পান। কিন্তু মুসলমান কর্তৃক তখনো কোন ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। স্বভাবতই সংবাদপত্র ক্ষেত্রে এ শূন্যতা তাঁকে এবং দেশ হিতৈষী অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

অবশেষে ব্যারিস্টার এ. রসুল, আবুল কাসেম স্যার আবদুল হালিম গজনভী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় 'the Musalman প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার ম্যানেজারের ভার দেয়া হলো মুজীবুর রহমানের উপর। পরে পত্রিকার সম্পাদনার সামগ্রিক দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হয়। এখান থেকেই মুজীবুর রহমানের সাংবাদিক জীবন তথা প্রকৃত কর্ম-জীবন শুরু হয়।

শুধু সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করেই মুজীবুর রহমান ক্ষান্ত ছিলেন না, রাজনীতি চর্চাতেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তি তুরস্ককে

www.pathagar.com

গ্রাস করে। ফলে তুরস্কের খলিফার পতনের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং মুসলিম জাহানে খিলাফতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। খিলাফত আন্দোলনে মুজীবুর রহমান প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এ আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর থেকে ১৯২২-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তাঁকে কারাভোগ করতে হয়। জেলে বসে তিনি 'জেল জীবনের ডায়রী' লিখেছিলেন। এ ডাইরীর ভাষা ও বাচনভঙ্গি এত সুন্দর ও নিখুঁত যে, এ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ডায়রীর কতিপয় অংশ নিম্নে প্রদত্ত হল :

"১৯২১-এর ৯ই ডিসেম্বর ৩টা ৪৫ মিনিটে প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা কমিটির কলকাতার ৯৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোডে হওয়ার কথা ছিল। ঐ সময় আমরা কয়েকজন সদস্য বাকী সদস্যদের আগমন প্রতীক্ষায় একটি রুমে বসেছিলাম। তখন দেখি কয়েকজন গোঁড়া সার্জেন্ট, দুইজন ভারতীয় অফিসার আর কয়েকজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে খেলাফত অফিসটাই ঘিরে ফেলল। আমাদের বলা হল বাইরে বারান্দায় দাঁড়াতে। একজন ভারতীয় অফিসার বললেন, 'খেলাফত কমিটির সব সভ্যের বিরুদ্ধেই গ্রেফতারী পরোওয়ানা আছে।'"

"আমাদের হাজতে ঢুকালো না, একটা বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসতে হুকুম দেওয়া হলো। অথচ কোন আসনই ছিল না। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আমরা মেঝের উপরই বসে রইলাম।..... জানানো হলো আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে বেআইনী আটক রাখা। মোহাম্মদ আলী নামক এক সিভিল গার্ডকে নাকি আমরা ঐ দিন সকালে খেলাফত অফিসে আটক রেখে গালাগালি দিয়েছি। শুনে ত বিস্ময়ে অবাক !... ...জীবনে বোধ করি প্রথমবারের মত মাথার নীচে বালিশ ছাড়া আমাকে শুতে হলো। ...সকালে প্রস্রাব পায়খানার অত্যন্ত বে এন্তেজাম দেখেই আমরা সবচেয়ে বেশী অবাক হলাম। কোন পর্দা ছিল না বলে সকলের

www.pathagar.com

চোখের সামনেই সাড়া দিতে হতো এসব প্রাকৃতিক কাজে। স্মরণীয় মূহূর্তে সব কুসংস্কার তলিয়ে গেল। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসে একই রান্না করা খাদ্য সানন্দে গ্রহণ করলো। ৯ই ফেব্রুয়ারী রাজদ্রোহের অপরাধে মওলানা আবুল কালাম আযাদের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। প্রেসিডেন্সী জেল থেকে এবার তাঁকেও আনা হল এ জেলে এবং ইউরোপীয় ওয়ার্ডে তিন নম্বরের উপর তলায় ১৩ নম্বর জেলেই তাঁকে রাখা হল। অর্থাৎ যেখানে আমি ছিলাম।"

"জেলের মধ্যেও তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন সোচ্চার কণ্ঠে। সাধারণত কয়েকজনের প্রতি যে অমানুষিক ব্যবহার করা হতো তার প্রতিবিধানের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পেশ করতেন। এতে করে মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়" তাঁর ডাইরীটা ইংরেজী ভাষায় লিখিত এবং শেষের দিকে অসম্পূর্ণ। সুতরাং তাঁর জেল জীবনের শেষ দিনগুলোর কথা জানতে পারা যায় নি। মৌলবী মুজীবুর রহমানের আটক অবস্থায় যে-সব মুসলমান নেতৃবৃন্দ তখন জেলে ছিলেন, তাঁরা হলেন—ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মৌলবী আবদুর রাজ্জাক, নজির আহমদ প্রমুখ।

জেল থেকে বের হওয়ার পর মুজীবুর রহমান 'দি মুসলমান'কে সপ্তাহে তিনদিন করে প্রকাশ করতে থাকেন। অবশ্য সাপ্তাহিক সংস্করণের প্রকাশ অব্যাহত ছিল। ১৯২৬ সালে তিনি 'খাদেম' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে 'দি মুসলমান পাবলিশিং কোং' নামে একটি লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হয়। তিনি 'দি মুসলমান' এবং 'খাদেম'-এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। করটিয়ার সুবিখ্যাত জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, মুজীবুর রহমান, সৈয়দ নাসিম আলী, মিঃ নুরুল হক চৌধুরী, ব্যারিস্টার আতাউল হক. মৌলবী আবদুর রউফ, জমিদার মোহাম্মদ আজিম ও আশরাফউদ্দীন চৌধুরী কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে তিনি কলিকাতা করপোরেশনের আণ্ডারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। খিলাফত আন্দোলনের সময় তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস ও প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির সম্পাদক পদেও নিযুক্ত হন। তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগে কমিটির সভাপতি পদেও নিযুক্ত হন। তিনি নিখিল ভারত সাংবাদিক সমিতির প্রথম সভাপতি। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

১৯৩৪ সালে ডিরেক্টরদের সংগে মতভেদের দরুন মুজীবুর রহমান তাঁর অতি সাধের 'দি মুসলমান'-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তৎপর তিনি 'কমরেড' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে তাঁর অভাবে 'খাদেম' এবং 'দি মুসলমান' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

ক্রমে মুজীবুর রহমানের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসে। ১৯৩৭ সালে তিনি দুরারোগ্য পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭১ বৎসর। তাঁর মৃত্যুতে দেশ এক মহান উদারচেতা সংগ্রামী পুরুষকে হারাল।

মুজীবুর রহমান ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন নিরাসক্ত, নির্লোভ, নিরহংকারী ও কঠিন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি মুজীবুর রহমান সম্বন্ধে বলেছেন, "জীবনে তাঁর মত মানুষ অল্পই দেখেছি।" জনসাধারণ তাঁকে 'নেহালপুরের দরবেশ' নামে অভিহিত করেছিল। কতখানি অনুপম চরিত্রের অধিকারী হলে মানুষ এরূপ আস্থাভাজন হতে পারে তা বিবেচনার বিষয়।

'অমৃতবাজার' পত্রিকা তাঁর মৃত্যুর পর লিখেছিল—'তিনি ছিলেন অসীম সাহসী। আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য তিনি সর্বত্র শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সমগ্র জীবন তিনি সংগ্রাম করে কাটিয়েছেন কিন্তু কখনো নীতির প্রশ্নে আপোষ করেন নি। দেশবন্ধু তাঁকে কলকাতা করপোরেশন ও বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্যপদে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর মনোভাব ছিল অনমনীয় ও প্রচারবিমুখ।"

কলকাতা করপোরেশনের মুখপত্র সাপ্তাহিক মিউনিসিপ্যাল গেজেট লিখেছিল, "মুজীবুর রহমানের মৃত্যুতে প্রদেশের সাংবাদিকতা ও জনজীবন নিঃসন্দেহে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি স্বদেশ ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করেছেন।"

বস্তুত পরাধীন দেশে তাঁর মত খাঁটি মানুষ ছিল বিরল। নেতাজী সুভাষ বসু বলেছেন "আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে এই রকম মানুষ খুব কমই দেখেছি। একথা লৌকিক নয়, ইহা আমার প্রাণের ধারণা" তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা হতে এ উক্তির সমর্থন মিলে। তিনি ছিলেন চিরকুমার। হয়ত দেশ-সেবার মহৎ-কার্যের ভারে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজল বলেছেন: "মুজীবুর রহমান ছিলেন একনিষ্ঠ আদর্শবাদী আর ছিলেন চিরকুমার। আমি তাঁকে মাত্র কয়েকবার দেখবার সুযোগ পেয়েছি – সম্পাদকীয় টেবিলে লেখারত নিরহংকার মুজীবুর রহমানের সৌম্যমূর্তি আজো আমার মনে আছে। শান্তগম্ভীর চেহারার লোক ছিলেন তিনি। শুনেছি তাঁর প্রকৃতিও ছিল তাই। তাঁর লেখা সম্পাদকীয় ছিল আবেগহীন, কিন্তু নির্ভরযোগ্য —এজন্য তাঁর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। ইংরেজী শিক্ষিত আর চাকরিজীবী মুসলমানদের টেবিলে টেবিলে তখন একমাত্র 'দি মুসলমান'ই শোভা পেত। মুজীবুর রহমান সব সময় নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতেন। তিনি গোঁড়া ছিলেন না কিন্তু তাঁর ধর্মবোধ

www.pathagar.com

ছিল প্রবল। স্বভাবে এমন কি পোশাক-পরিচ্ছদেও তিনি স্বকীয়তা রক্ষা করে চলতেন। আচকান পাজামা আর চটি ছাড়া তাঁকে কখনও দেখা যায়নি।"

ইচ্ছা করলেই তিনি অনায়াসে যোগ্যতাবলে উচ্চপদ লাভ করে জীবনে প্রাচুর্য আনয়ন করতে পারতেন। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপোষ করে তিনি স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করাকে রীতিমত ঘৃণা করতেন।

তিনি যে কতখানি নির্লোভ এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ছিলেন, নিম্নের ঘটনা থেকে তার প্রমাণ মিলে। প্রাদেশিক কংগ্রেসের এডহক কমিটির তিনি ছিলেন সম্পাদক। উক্ত কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। কিন্তু দেশবন্ধুকে বিভিন্ন কাজে সারা ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াতে হতো। তাই প্রায়ই তিনি কলকাতায় অনুপস্থিত থাকতেন। নির্বাচন উপলক্ষে হাজার হাজার টাকা খরচ হত। দেশবন্ধু চেক সই করে মুজীবুর রহমানকে বলতেন "প্রয়োজনীয় অংক আপনিই বসিয়ে নেবেন।" মুজীবুর রহমান এ কাজে অসম্মতি জানালে দেশবন্ধু বলেছিলেন, "আমরা যদি মুজীবুর রহমানের মত লোকদেরও বিশ্বাস করতে না পারি, তাহলে মনে করব আমরা এখনো স্বাধীনতার উপযুক্ত হয় নি।" প্রখ্যাত অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জী, 'দি মুসলমান' এ একটি লেখা দেবার জন্য কথা দিয়েছিলেন। বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন লেখা দিলেন না তখন মুজীবুর রহমান তাঁকে লিখেছিলেন—"যে কথা রক্ষা করতে পারবেন না তেমন কথা দেন কেন" এমনি ছিল মুজীবুর রহমানের চরিত্র।

তাঁর সাহিত্য প্রতিভাও ছিল সুপরিচিত। তাঁর লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ছিল অত্যন্ত উঁচুদরের। ভাব, ভাষা এবং বর্ণনার বৈশিষ্ট্যে তাঁর প্রত্যেকটি লেখা প্রশংসার দাবীদার।

সর্বোপরি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মুজীবুর রহমান ছিলেন বাঙালী মুসলমান সমাজের পথিকৃৎ। বলিষ্ঠ ও নির্দোষ সাংবাদিকতার জন্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর চরিত্র, সাধনা এবং মহত্ত্ব আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে বাঙালী মুসলমান সমাজ ছিল সর্বতোভাবে পশ্চাদপদ। তখন মুসলিম সাহিত্যসেবী ছিল এক প্রকার দুর্লভ। সাহিত্যের সর্বশাখায় বাঙালী হিন্দুরা ছিল অগ্রগামী। এই অনগ্রসরতার যুগে এমনি এক মহান গবেষকের আবির্ভাব হল, যাঁর অপূর্ব নিষ্ঠা ও নিরলস সাধনার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে বাঙালী মুসলমানদের লুপ্তপ্রায় বিপুল সাহিত্যকীর্তি। এই জ্ঞানতপস্বী গবেষকের নাম মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। বস্তুত মুন্সী সাহেব তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে ছিলেন একক ও অনন্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গবেষণাক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে তুলনা দেয়া যেতে পারে এমন একজনের নামও এদেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মুন্সী সাহেবের আগে মধ্যযুগের সাহিত্য তথা পুঁথি সাহিত্য ছিল অজ্ঞাত ও অবহেলিত। কি বিরাট বিপুল সাহিত্য আমাদের পুঁথিকারগণ রচনা করে গেছেন তার খবর কেউ রাখত না।

হিন্দু গবেষকগণ মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে কিছু কিছু গবেষণা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সে গবেষণা ছিল অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী। তাঁরা কেবল মধ্যযুগের হিন্দুদের রচিত সাহিত্যের মধ্যেই নিজেদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এ প্রচেষ্টা ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেই মনে হয়। হিন্দু গবেষকগণ মধ্যযুগের মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যের উপর যথাযথ আলোক সম্পাত করেন নি। মুসলমানগণ মধ্যযুগে আদৌ বাংলা সাহিত্যচর্চা করেছে কিনা এদের গ্রন্থ পাঠে সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ আমাদের সে অসম্পূর্ণতা ও গ্লানিকে মুছে দিলেন। মধ্যযুগের সাহিত্যের বিশাল সমুদ্র হতে তিনি টেনে তুললেন এক বিরাট সম্পদ। নিরলস সাধনা ও বিরামবিহীন প্রচেষ্টার দ্বারা তিনি প্রমাণ করলেন মুসলিম

www.pathagar.com

রচিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল কত বিশাল, কত উন্নত। মুসলমান কবিগণ ভাব, ভাষা ও রচনার দিক থেকে হিন্দুদের চেয়ে ছিল অনেক উন্নত। কালের খনি থেকে তিনি উদ্ধার করলেন এক অমূল্য রত্নের ভাণ্ডার। বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে তিনি উদ্ধার করলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল ও দৌলত কাজীকে। আমরা জানতে পারলাম আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে, আবিষ্কার করলাম নিজের গৌরবময় পরিচয়কে।

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে (বাংলা ১২৭৬ সালের আশ্বিন) চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী নামে মুন্সী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী নূরউদ্দীন ও পিতামহের নাম মোহাম্মদ নবী চৌধুরী।

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের বংশ 'কাদির রাজার বংশ' নামে পরিচিত। সাহিত্য বিশারদের পূর্বপুরুষ কাদির রাজা ওরফে আবদুল কাদির হাবিলাম দ্বীপ থেকে সুচক্রদণ্ডীতে এসে বসবাস শুরু করেন।

সাহিত্য বিশারদ যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁর পিতা মারা যান। পিতৃব্য মুন্সী আইনউদ্দীন তাঁকে পরম স্নেহে লালন পালন করেন। মাত্র এগার বৎসর বয়সে তিনি পিতৃব্য কন্যাকে বিবাহ করেন।

স্বীয় বাসভবনে তিনি সামান্য আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। তৎপর এক বৎসর কাল সুচক্রদণ্ডীতে মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি পটিয়া হাইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাস করেন এবং চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরীক্ষার আগেই তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়াশোনা বন্ধ করতে বাধ্য হন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় অধ্যয়ন করেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে।

কলেজ ত্যাগের পর তিনি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছুকাল তিনি সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজী স্কুলে প্রধান

www.pathagar.com

শিক্ষকের পদে শিক্ষকতা করেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামের ডিভিশনাল কমিশনারের অফিসে তিনি কেরানীর চাকুরী গ্রহণ করেন। সেই অফিসে কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ও কর্মরত ছিলেন। কবির নিকট সাহিত্য-বিশারদ সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ লাভ করেন। অফিসে বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি চাকুরীচ্যুত হন।

তৎপর সাত বৎসর আনোয়ারা মধ্য ইংরেজী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য বিশারদের সাহিত-চর্চা এ সময় থেকে শুরু হয়। তাঁর পিতামহের হাতের লেখা কিছু বাংলা পুঁথির সংগ্রহ ছিল। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই তিনি পুঁথির সহিত পরিচিত হন। এ পরিচিতি পরে আগ্রহে পরিণত হয়। আনোয়ারায় তিনি পুঁথি সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি চট্টগ্রামের স্কুল ইনসপেক্টরের অফিসে কেরানীর পদে নিযুক্ত হন। এ চাকুরী সাহিত্য বিশারদের আরব্ধ কাজ সম্পাদনে বিরাট সুযোগ এনে দেয়। কর্মোপলক্ষে বিভিন্ন এলাকার স্কুল শিক্ষকগণকে ইনস্‌পেক্টরের অফিসে যাতায়াত করতে হত। এ সূত্রে শিক্ষকগণ সাহিত্য বিশারদের নিকট পরিচিত হন। তিনি শিক্ষকদের সাহায্যে বিভিন্ন এলাকার হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করে তার উপর গবেষণা চালান।

১৯৩৪ সালে তিনি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। সাহিত্য বিশারদ তাঁর গবেষণার ফল বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্যের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন তিনি চিত্র-পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এ সময় 'চট্টগ্রাম ধর্ম-মণ্ডলী' নামক পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'সাহিত্য বিশারদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তৎপর নদীয়ার সাহিত্য সভা তাঁকে 'সাহিত্যসাগর' উপাধি দানে সম্মানিত করেন। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় এই সমিতির বার্ষিক সম্মেলন হয়। তিনি তাহাতে

www.pathagar.com

মূল সভাপতি ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নির্লোভ, নিরহঙ্কার ও বন্ধুবৎসল। তাঁর ছাত্ররা তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

সাহিত্য বিশারদের স্বাস্থ্য বরাবরই খারাপ ছিল। তাঁর গড়ন ছিল হালকা পাতলা। গবেষণাকার্যে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়ে। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর এই জ্ঞানসাধক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর আসন বাংলা সাহিত্যে এখনো শূন্য।

এতক্ষণ সাহিত্য বিশারদের জীবন-কথা বর্ণনা করা হল। এবার তাঁর সুমহান সাহিত্য সাধনা ও কথা কর্ম জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

কথায় বলে "উঠন্তি মূলার পত্তনে চেনা যায়"। সাহিত্য বিশারদ সম্বন্ধে প্রবাদটি পুরোপুরি প্রযোজ্য। বাল্যকাল থেকেই তিনি পুঁথি সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক ও রসগ্রাহী ছিলেন। প্রত্যেকটি পুঁথির মধ্যেই তিনি যেন রহস্যের এক মায়াপুরী আবিষ্কার করতেন। বাল্যের এ কৌতূহল তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের স্বর্ণ-সোপান। হস্তলিখিত পুঁথির সংগ্রহে ছিল তাঁর বিরাট আনন্দ। তিনি শুধু সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হন নি; রীতিমত অনুসন্ধান করেছেন পুঁথির প্রতেকটি বিষয়। শোনা যায় তিনি নাকি মধ্যবয়সে চল্লিশটি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। কতখানি জ্ঞান-পিপাসু হলে সামান্য বেতনভোগীর পক্ষে এরূপ ব্যয়সাধ্য কাজে হাত দেওয়া সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। তিনি বলতেন "Book worm' বলিয়া একটা কথা আছে; আমি 'পত্রিকা worm"।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গবেষণাকে তিনি জীবনের এক সুমহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ গবেষণালব্ধ ফল তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। তখনকার দিনে এমন কোন পত্রিকা ছিল না, যাতে সাহিত্য-বিশারদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। তাঁর সাধনা ছিল বিরামবিহীন এবং লেখনী ছিল অবিশ্রান্ত। তদানীন্তন পত্র-পত্রিকা 'নিমা', 'সংহতি', 'সাহিত্য', আশা', 'ইসলাম প্রচারক',

www.pathagar.com

'বীরভূমি', 'অবসর,' 'সাহিত্য', 'পরিষদ পত্রিকা', 'ভারত সুহৃদ', 'প্রদীপ', 'কোহিনূর', 'সেকালে', 'নবনূর,' 'সুধা', 'আরতী', 'বঙ্গ দর্শন', 'প্রকৃতি', 'রেনু', 'অর্চনা', 'সুধাকর', 'স্বদেশী', 'বৌদ্ধ পত্রিকা', 'প্রাচী', 'কল্পতরু', 'অংকুর', 'মানসী' 'মর্মবাণী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রতিভা', 'শিক্ষা সমাচার', 'সম্মিলন', 'বিজয়া সৌরভ', গৃহস্থ সম্মিলনী', 'সুপ্রভাত', 'হিতবাদী', 'সংকলন,' 'যমুনা', 'আর্যাবর্ত', 'তপোবন', 'নোয়াখালি', 'স্ত্রীভূমি', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'আল-ইসলাম', 'সওগাত'. 'সাহিত্য সংবাদ', 'কায়স্থ পত্রিকা সাধনা', 'গণশক্তি', 'পূরবী', 'দেশপ্রিয়', 'বুলবুল', 'সত্যবার্তা 'মিহির ও সুধাকর', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'পাঞ্চজন্য', 'আল-ইসলাম', 'পার্বণী', 'মদীনা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক।

আনোয়ারা হাইস্কুলে শিক্ষকতার প্রাক্কালে তাঁর সংগৃহীত পুঁথির উপর ভিত্তি করে তিনি ১৩০২ খ্রীস্টাব্দে 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় 'অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এটাই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু সবাই বিস্ময়বিমুগ্ধ মনে উপলব্ধি করতে পারলেন বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি প্রতিভার আবির্ভাব সূচিত হয়েছে।

তিনি শুধু প্রবন্ধই লিখতেন না, সাহিত্য-সমালোচক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি 'সাধনা,' 'নবনূর', 'সওগাত', 'পূজারী' ইত্যাদি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ছিল তাঁর অন্যতম বিচরণক্ষেত্র। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তিনি উক্ত পরিষদের অনেকগুলি পুঁথি সম্পাদনা করেছেন। আলি রাজার জ্ঞানসাগর, শেখ ফয়জুল্লার গোরক্ষ বিজয়; মৃগলুব্ধ, সারদা মঙ্গল ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি নিপুণতার সাথে সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রচিত দুই খণ্ডে বিভক্ত বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ একটি অনুপম গ্রন্থ। তিনি দীনেশচন্দ্র সেন ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য

www.pathagar.com

সম্পাদিত গোপীচন্দ্রের গান পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ডক্টর মুঃ এনামুল হকের সহযোগিতায় তিনি 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। মুসলমানদের প্রাচীন সাহিত্য কীর্তি উদ্ধারের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি একটি অনন্য সম্পদ।

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল ও দৌলত কাজীকে নিয়ে আজ আমরা মাতামাতি করছি, গর্ববোধ করছি এবং তাঁদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে ব্যাপক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। কিন্তু কবিদ্বয়কে বিস্মৃতির তমসা হতে টেনে উজ্জ্বল আলোক-মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সাহিত্য বিশারদের। তাঁর সংগৃহীত তথ্য না হলে ডঃ এনামুল হক 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' রচনা করতে সক্ষম হতেন কিনা সন্দেহ। সাহিত্য বিশারদের আগে কেউ জানত না —কি অতুলনীয় সম্পদ রেখে গেছেন মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্য সাধকগণ। বিস্মৃতির গুহা থেকে তিনি মধ্যযুগীয় বাংলার মুসলিম সাহিত্যকে গৌরবের স্বর্ণশিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই একটি রূপকথা মনে পড়ে যায়—"এক রাজ্যে নিঃসন্তান রাজা রাজত্ব করতেন। রাজার মৃত্যু হল। কিন্তু সিংহাসনে বসবে কে? সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, রাজার হস্তীকে ছেড়ে দেয়া হবে। হস্তী যাকে তুলে নিয়ে আসে সে হবে রাজা। রাজার হাতী ছেড়ে দেয়া হল। পথে ক্ষুধার যন্ত্রণায় বিমর্ষ হয়ে বসেছিল বিধবার একমাত্র সন্তান। হস্তী তাকে পিঠে তুলে নিয়ে এল। দুঃখিনীর অখ্যাত ছেলে পেল রাজাসন।" ঠিক তেমনিভাবে সাহিত্য বিশারদ অজ্ঞাত প্রাচীন মুসলিম সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের রাজাসনে স্থান করে দিলেন। তাঁর সাহিত্য সাধনাকে শ্রদ্ধার সংগে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বোমকেশ মুস্তফী, দীনেশচন্দ্র সেন, ক্ষিতি মোহন সেন, ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ মনীষিগণ।

সাহিত্য বিশারদের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমী আয়োজিত সভায় ডঃ মুঃ এনামুল হক নিজেকে সাহিত্য বিশারদের মানস সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

মুন্সী সাহেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'পদ্মাবতী' সম্পাদনা। 'পদ্মাবতী' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে একটি অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড।

১৩৬৫ সালের ভাদ্রমাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'পুঁথি পরিচিতি' প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ডঃ আহমদ শরীফ। এ গ্রন্থের সম্পূর্ণ বিবরণ ও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন মুন্সী সাহেব।

এ পুস্তকের প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব লিখেছেন—"জনাব আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ দশ বৎসর পূর্বে প্রকাশের আশায় তাঁর 'পুঁথি পরিচিতি' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে দিয়ে যান। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন এর পূর্বে পুঁথি পরিচিতি কেন, এ বিভাগের কোন গবেষণাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। - - - উপাদানের অভাবে এ যাবত মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের যথার্থ ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়নি। 'পুঁথি পরিচিতি' বহুল পরিমাণে আমাদের সে অভাব দূর করবে। সাহিত্য বিশারদ রচিত এ আলোকবর্তিকার সাহায্যে অনুসন্ধিৎসু পাঠক আমাদের অতীত ঐতিহ্যের দ্বারোদঘাটন করতে পারবেন।" ১৩৭১ আশ্বিনে সাহিত্য বিশারদের 'ইসলামাদ' গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী হতে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের তথ্যসমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন। বিশেষতঃ উক্ত অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা ভাষাতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য।

তাঁর জন্মভূমি চট্টলাকে কত ভালবাসতেন তিনি। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর চোখে মায়া অঞ্জন এঁকে দিত। 'ইসলামাদ' গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি লিখেছেন "ইসলামাবাদ প্রকৃতির চির লীলানিকেতন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ইহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে, ভারতে এমন স্থান অতি অল্পই আছে। প্রকৃতিসুন্দরী তাহার সকল সুন্দর বস্তু হইতে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করিয়াই যেন আমাদের জন্মভূমির গায়ে মাখাইয়া

www.pathagar.com

দিয়াছেন। ইহাকে সৌন্দর্য ললামভূতা সৌন্দর্যের রাণী বলিলেও তাহার কিছুই বর্ণনা করা হয় না।"

সাহিত্য বিশারদের সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা হাজারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। পুঁথি বিষয়ক রচিত প্রবন্ধের সংখ্যাই পাঁচ শতাধিক। যেখানে যখনই তিনি পুঁথির সন্ধান পেয়েছেন তখনই তথায় গমন করে তা উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা থেকে তিনি পুঁথি ও পুঁথির উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সাপের মানিক পেলে মানুষ যেমন আনন্দিত হয়, কোন পুঁথির সন্ধান পেলে সাহিত্য বিশারদ তার চেয়েও অধিক আনন্দিত হতেন। এ ব্যাপারে ডক্টর এনামুল হক এক চমৎকার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন :

"এতদসত্ত্বেও কেরানী জীবনের একটি দোষ আবদুল করিমের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছিল—তা হচ্ছে ঘুষ খাওয়ার প্রবৃত্তি। জীবনে বহু ঘুষখোর দেখেছি কিন্তু আবদুল করিমের মত এমন ঘুষখোর কেরানী কখনও দেখিনি, স্কুলের সরকারী সাহায্য-বণ্টন বিভাগের ভার ছিল তাঁর হাতে। কোন্ স্কুল নূতন সাহায্য চায়, কোন্ স্কুল প্রাপ্ত সাহায্য বহাল রাখতে পারছে না, আবার কোন্ স্কুল প্রাপ্ত সাহায্য বাড়াতে চায়, তারা সবাই তাঁর অফিসে, তাঁর বাসায় ভিড় জমাতো। তখন তাঁকে প্রকাশ্যে বলতে শুনেছি আপনাদের দাবী যথার্থ প্রমাণিত হয়নি, আমার পাওনা আপনারা আদায় করেননি। আপনারা যে শিক্ষায় উৎসাহী ও সমাজ কর্মী তার প্রমাণ নেবার ভার আমার হাতে। আর তার প্রমাণ দেওয়ার ভার আপনাদের নিজেদের কাছে। সে প্রমাণ যে আপনারা দিতে পারেন নি, হয়তো দেওয়ার চেষ্টাও করেন নি। যান, পুঁথির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে নিয়ে আসুন, নিশ্চয় আপনাদের আবেদন বিবেচনা করা হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল, একরাশ পাণ্ডুলিপি এসে হাজির হয়েছে, আর আবদুল করিম সাহেব তার পাতা উল্টোতে উল্টোতে বলছেন "যান, সময়মতো দেখা যাবে।" সবাই জানতেন পুঁথি সংগ্রহ করে দিলে এই কেরানীটি তাদের কাজ করে

www.pathagar.com

দেবেনই। আশ্বস্ত হয়েই তখন সবাই তাঁকে সালাম দিয়ে বাড়ী ফিরতো। এই-ই হলো সাহিত্য বিশারদের ঘুষের নমুনা।

বস্তুত পুঁথি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্য বিশারদের সাধনা তুলনাবিহীন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন: "বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। তিনি এই দুর্লভ গ্রন্থের (রাধিকার মানভঙ্গ) সম্পাদন কার্যে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহৃদয়তা ও যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমস্ত বাংলায় কেন সমস্ত ভারতেও বোধ হয় সচরাচর মিলে না। এক-একবার মনে হয় যেন কোন জার্মান এডিটর এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।"

একথা ভেবে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে রোগ, দারিদ্র্য এতসব প্রতিকূল অবস্থার সংগে সংগ্রাম করে তিনি কিভাবে এত বিরাট কাজ সম্পাদন করে গেছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে পারে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। তাঁর সম্মুখে প্রাচীন সাহিত্য গবেষণার কোন দৃষ্টান্তও উপস্থিত ছিল না। তিনি নিজ হাতে যে বীজ রোপণ করেছেন, সেই বীজ তাঁর হাতেই অংকুর থেকে মহা-মহীরূহে পরিণত হয়ে ফুলে ফসলে সুশোভিত হয়ে উঠে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ও লজ্জা এই যে, তাঁর মত জ্ঞানতাপসকে সারাজীবন দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। প্রতিবন্ধকতা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা না থাকলে হয়ত তাঁর কাছ থেকে আমরা আরও বিপুল সম্পদ আহরণ করতে পারতাম। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে বিপুল সম্পদ তিনি আমাদের দান করেছেন, তার পরিমাপ করা সাধ্যের বাইরে। মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ বাহার বলেছেন 'হিন্দু পুরাণে দধিচি মুনীর উল্লেখ আছে দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের সাহায্যের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় অস্থি দান করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করতে গিয়ে একটি লোক অর্ধশতাব্দী ধরে তিল তিল করে জীবন দান

www.pathagar.com

করেছেন। ইনি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। বাস্তবিকই সাহিত্য বিশারদ বাংলা সাহিত্যের দধিচি।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামে পূর্ব পাকিস্তান প্রদর্শনী উপলক্ষে ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী জানুয়ারী সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য বিশারদ উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে এক অমূল্য ভাষণ দান করেন। উক্ত ভাষণে তাঁর ভাব, ভাষা, সাধনা ও মানস প্রকৃতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাই উক্ত ভাষণের অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল: "আমি পূর্ববঙ্গের মাটির মানুষ, সেই মাটিতে যে সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সাহিত্য সেই মাটির বাসিন্দাদের মনের আনন্দরসে হইয়াছে পুষ্ট, যুগ যুগ ধরিয়া যোগাইয়াছে তাহাদের মনের খোরাক। আমি সেই সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক, সেই সাহিত্যের রসেই আমার মনের রসভাণ্ডার হইয়াছে পূর্ণ, আমি সেই পুঁথি সাহিত্যরসের রসিক, তার ভাণ্ডারী ও তার প্রেমিক।"

"আজ আমি জীবনসায়াহ্নে দাঁড়াইয়া আমার মন ও কণ্ঠের সমস্ত জোর দিয়া, আপনাদের তথা সমগ্র দেশের সামনে অসংকোচে এই কথা ঘোষণা করিতে চাহি যে, পুঁথি সাহিত্য আবর্জনা নহে উপেক্ষার বস্তু নহে, সাহিত্যের দরবারে মূল্যহীন তুচ্ছ জিনিস নহে "

" ...আমাদের পুঁথি সাহিত্য আমাদের নতুন সাহিত্য ইমারতের বুনিয়াদ, তার ভিত্তিপ্রস্তর। আমাদের নবীন সাহিত্য মহীরুহের তাহা হইতেছে মূল, শিকড় ও কাণ্ড।"

"দরিদ্রের অকিঞ্চিৎকর সম্বল লইয়া আমি সাধ্যানুসারে অর্থ ও শরীরের রক্ত ব্যয় করিয়া একটার পর একটা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি, আজীবন যক্ষের ধনের মত এই সবকে আগলাইয়া রহিয়াছি, নষ্ট হইতে দিই নাই। কতবার কতভাবে আমি সমাজের দ্বারে আমার সংগৃহীত পুঁথিগুলির বিবরণ প্রকাশের জন্য ভিক্ষার হাত প্রসারিত করিয়াছি। কিন্তু কেহ ত সাড়া দেয় নাই।"

www.pathagar.com

"লিপস্টিকে ঠোঁট রাঙা হইতে পারে, দিল কিন্তু কখনো রাঙা হয় না, অথচ সাহিত্য হইতেছে দিল জিনিস। মুখের বুলি যখন দিলের বুলি হইয়া উঠে তখনই মাত্র তাহা সাহিত্যের বস্তু হইতে পারে।"

"...সাহিত্যের প্রধান উপকরণ মানুষ, মানুষের অন্তরে যিনি প্রবেশ করিতে পারেন তিনিই সাহিত্যিক, তিনিই স্রষ্টা।...সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিমের 'নূরনামা' নামক পুঁথির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার টানিলাম" :

যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুড়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ না যায়।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মন হিত অতি।

আজ বাংলা সাহিত্যের আঙিনা প্রাচীন সাহিত্য গবেষকের কোলাহলে মুখরিত। পুঁথি সাহিত্য আজ আমাদের আদরের সামগ্রী ও গৌরবের বস্তু। এর মূলে নিহিত রয়েছে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সাধনা। তাঁর সংগৃহীত পুঁজি আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ। সাহিত্য বিশারদের নামও তাই আমাদের সাহিত্য ও জাতীয় জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

মীর মোশাররফ হোসেন

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে মীর মোশাররফ হোসেনের অবদান অবিস্মরণীয়। রসের প্রাচুর্যে আনন্দ-বিষাদে ও ভাষার লালিত্যে 'বিষাদ-সিন্ধুর' সমকক্ষ দ্বিতীয় উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিগত শতাব্দীতে বাংলার বাঙ্গালী মুসলমানদের সাহিত্যক্ষেত্রে চলছিল তমসার যুগ। এই ঘনান্ধকারে মীর সাহেব আলোর দীপালী জ্বেলে দিলেন। আব্দুল লতিফ চৌধুরী বলেছেন: "সামাজিক উন্নতি বিধানে, ইসলামিক সভ্যতা সংস্কৃতির সম্প্রসারণে তাঁর লেখনী ছিল সদা জাগ্রত ও অক্লান্ত। তাঁর সাহিত্য সাধনা, সংস্কৃতি গঠনের উদ্যম-প্রচেষ্টা এক যুগে আমাদিগকে মননশীলতার বন্ধ্যাত্ব ও নিষ্ক্রিয়তার কলঙ্ক থেকে রক্ষা করেছে। শুধু তাই নয়; তাঁর বিরামহীন সাধনার আশাতীত সাফল্য সমাজ ও জাতির মুখোজ্জ্বল করেছে। সত্যই মীর মোশাররফ হোসেন আমাদের গৌরবের পাত্র।"

মীর মোশাররফ হোসেনের পূর্বপুরুষ সৈয়দ সাদুল্লা দিল্লী থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শেষপ্রান্তে শেষ মোগল সম্রাটের প্রধান সেনাপতির পদ অলংকৃত করেন তিনি। ফরিদপুর জেলার বেলগাছি স্টেশনের নিকট তিনি এসে উপস্থিত হন। তাঁর স্বর্গীয় চেহারা এবং মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ জনসাধারণ তাঁর চতুষ্পার্শে ভিড় জমাতে আরম্ভ করে। এতদঞ্চলে তখন ভালোভাবে ইসলাম প্রচারিত হয়নি। সাদুল্লা সাহেব এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচারের মনস্থ করেন। সমাজের নিগৃহীত নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা দলে দলে তাঁর নিকট এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর ফরিদপুরের জাগড়া গ্রামে বসতবাটি নির্মাণপূর্বক তিনি তথায়

www.pathagar.com

অবস্থান করেন। তিনি উক্ত গ্রামের এক বিত্তশালী ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করেন।

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী সৈয়দ সাহুল্লা সাহেবের বংশধারা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পেশ করেছেন ঃ

সৈয়দ সাহুল্লা
মীর উমর দরাজ
মীর ইব্রাহিম হোসেন
মীর মুয়াজ্জম হোসেন
মীর মোশাররফ হোসেন
মীর মুহতেশাম হোসেন (Bar at law)
এক কন্যা।

মীর মোশাররফ হোসেন ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে গৌরী নদীর তীরবর্তী লাহিড়ীপাড়া গ্রামে সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মীর মুয়াজ্জম হোসেন সে অঞ্চলে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। প্রশংসনীয় কাজের জন্য তাঁরা মীর উপাধি লাভ করেন। তাঁদের বংশগত উপাধি সৈয়দ। মীর মোশাররফ হোসেনের পিতা ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। আরবী ও ফারসী ভাষায় তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। নিজে শিক্ষার কদর বুঝতেন। তাই তিনি পুত্রের শিক্ষারও সুবন্দোবস্ত করেন। মীর মোশাররফ হোসেন জগৎমোহন নন্দীর পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন। পদমদীর নবাবের স্কুল এবং কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলেও তিনি লেখাপড়া করেছিলেন। তাঁর বাড়ীর নিকটবর্তী কুমারখালীতে তখন সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতের চর্চা হত। এখানেই তিনি সাহিত্য ও সংগীতের অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

ষোল বছর বয়সে তিনি কলকাতা গমন করে পিতৃবন্ধু নাদির হোসেনের বাসায় উপস্থিত হন। নাদির হোসেন সাহেব এই প্রতিভাশালী বন্ধুপুত্রের গুণে মুগ্ধ হন এবং পড়াশুনার জন্য কালিঘাট হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন।

www.pathagar.com

বাসায় অবস্থানকালে মীর সাহেব নাদির হোসেনের প্রথমা কন্যা লতিফুন্নেছার প্রতি আকৃষ্ট হন। অচিরে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু অতি বিস্ময়ের সহিত বাসর ঘরে তিনি অবলোকন করলেন নববধূ তাঁর মনোনিতা পাত্রী লতিফুন্নেছা নন। বরং লতিফুন্নেছার কনিষ্ঠ সহোদরা আজিজুনেছা। এ ঘটনা দর্শনে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। আজিজুন্নেছা ছিলেন অতি কুৎসিত ও মন্দ স্বভাবের। তাই মীর সাহেবের দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত অসুখী। 'আমার জীবনী'তে তিনি একটি মেম বিয়ে করেছিলেন বলেও উল্লেখ করেছেন। অসহ্য দাম্পত্য জীবনে সুখান্বেষণের আশায় হয়তো তিনি এ বিবাহ করেছিলেন। বিবি কুলসুম তাঁর তৃতীয় পত্নী। কুলসুম ছিলেন এক বিধবা মায়ের কন্যা। মীর সাহেব জমিদারী তদারকের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াবার সময় অশ্বপৃষ্ঠ হতে বালিকা কুলসুমকে দেখেন। কুলসুম বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁদের বাড়ীতে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে মীর সাহেবের পাশের বাড়ীতে অবস্থান করেন। পরে তিনি কুলসুমকে ঘরে নিয়ে আসেন। পত্নী আজিজুন্নেছা বেগমের বিরোধিতা সত্ত্বেও কুলসুমকে তিনি বিবাহ করেন। বিবি কুলসুম ছিলেন অত্যন্ত স্বামীভক্ত পত্নী। মীর সাহেবের এ দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের হয়েছিল। তিনি বিবি কুলসুমকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু জীবনের প্রথম প্রিয়া লতিফুন্নেছাকে তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। লতিফুন্নেছার স্মৃতি স্মরণ করে তিনি শেষ জীবনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

মীর মোশাররফ হোসেন ছিলেন জাত সাহিত্যিক। বাল্যকাল থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেন। কুষ্টিয়ার 'গ্রামবার্তা' সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ ছিলেন তাঁর সাহিত্যগুরু। তিনি কাঙাল হরিনাথকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত মান্য করতেন। প্রতি সপ্তাহে তিনি 'গ্রামবার্তা'য় সংবাদ লিখতেন। 'প্রভাকর-এও তিনি নিয়মিত লিখতেন।

www.pathagar.com

তিনি 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রবন্ধ লিখতেন। এ পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি সাহিত্য রচনা আয়ত্ত করেন। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'আজিজননেহার' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা করেন।

অতঃপর তিনি ফরিদপুরের পদমদী নবাব স্টেটে ম্যানেজারী পদ লাভ করেন। ১২৯১ সালে তিনি টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার স্টেটের ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি বিবি কুলসুমের সংগে অবস্থান করতেন। তাঁর সাহিত্যের বিরাট অংশ টাঙ্গাইলেই রচিত হয়। ১৩১৬ সনে মীর মোশাররফ হোসেন পদমদী গমন করেন। তথায় ৩১৬ সনে ২৬ অগ্রহায়ণ তাঁর প্রিয়তমা পত্নী বিবি কুলসুম ধরাধাম ত্যাগ করেন। কুলসুমের সমাধিগাত্রে মীর সাহেব কর্তৃক রচিত নিম্নোক্ত কবিতাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

জীবনের নিয়োজিত কার্য শেষ করি,
দয়ামায়া ভালবাসা স্নেহ পরিহরি,
বসন, ভূষণ, ধন আত্মীয়-স্বজন,
লালসা-বাসনা ভোগ করি বিসর্জন
স্বামী সোহাগিনী বিবি কুলসুম হেথায়
সমাধি শয্যায় রয় অনন্ত নিদ্রায়।
পঞ্চপুত্র, এক কন্যা, রাখি প্রাণপতি
জগৎ ছাড়িয়া স্বর্গে করিতে বসতি
তের শত ষোল সাল ছাব্বিশে অঘ্রাণ
রবিবার প্রাতে প্রাণ করিল প্রয়াণ।
পতিগতি প্রণোধনী পতিসহ আশি
পদমদীর মৃত্তিকায় রহিলেন মিশি।
ভাই-ভগ্নি যেই হও ক্ষণেক দাঁড়াও।
আত্মার কল্যাণ তার আশিষিয়ে যাও।

পত্নী বিয়োগের ফলে মীর সাহেব শোকে দুঃখে ভেঙে পড়েন। তাঁর

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ে। অবশেষে বঙ্গের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর নশ্বর দেহ পদমদীতে সমাহিত করা হয়।

মীর সাহেবের পুত্র-কন্যার নাম নিম্নে প্রদত্ত হল: মীর ইব্রাহিম হোসেন, মীর আশরাফ হোসেন, মীর উমর দরাফ, মীর মাহবুব হোসেন, মীর মোশতাক হোসেন, বিবি রওশন আরা ও জমজ দুই কন্যা—বিবি আমেনা ও বিবি রাহেলা।

মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্য-প্রতিভা ছিল সর্বত্রগামী। বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি লেখনী চালনা করেছিলেন। তাঁর মত শক্তিমান লেখক হিন্দু সমাজেও অল্পই ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "একদিকে বিদ্যাসাগরের যে স্থান অন্যদিকে 'বিষাদ-সিন্ধু' রচয়িতা মীর মোশাররফ হোসেনের স্থান ঠিক অনুরূপ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যেমন পঠিত হইয়াছিল, 'বিষাদসিন্ধু'তেমনি আজও জাতীয় মহাকাব্যরূপে বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয়। বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ হিসাবে সকল সমাজেই এই গদ্য কাব্যখানির সমান আদর।"

গবেষকরা এ পর্যন্ত মীর সাহেবের ৩৮খানা পুস্তকের সন্ধান পেয়েছেন। সন্ধানপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. রত্নবতী (উপন্যাস) ১২৭৬ সাল, ১৮৬৯ খৃঃ
২. বসন্তকুমারী (নাটক) ১২৭৯ সাল, ১৭৭৩ খৃঃ
৩. জমিদার দর্পণ (নাটক) ১২৭৯ সাল, ১৮৭৩ খৃঃ
৪. গোড়াই ব্রীজ বা গৌরীসেতু (কবিতা) ১৮৭৩ খৃঃ
৫. বিষাদসিন্ধু (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
   মহরম পর্ব—১২৯৬ সাল, ১৮৮৫ খৃঃ
   উদ্ধার পর্ব—১২৯৪ সাল, ১৮৮৭ খৃঃ
   এজিদবধ পর্ব—১২৯৭ সাল, ১৮৯১ খৃঃ

www.pathagar.com

৬. সংগীত লহরী (গান) --১২৯৪ সাল, ১৮৮৭ খৃঃ
৭. গো-জীবন (প্রবন্ধ)—১২৯৫ সাল, ১৮৯৮ খৃঃ
৮. বেহুলা (গীতাভিনয়)—১২৯৬ সাল, ১৮৮৯ খৃঃ
৯. উদাসী পথিকের মনের কথা (উপন্যাস) ১৮৯৯ খৃঃ
১০. গাজী মিয়ার বস্তানী (রম্যরচনা) ১৩০৬ সাল, ১৮৯৯ খৃঃ
১১. মৌলুদ শরীফ (গদ্য পদ্য) ১৩০৭ সাল
১২. মুসলমানের বাংলা শিক্ষা (গদ্য)
১ম ভাগ—১৯০৩ খৃঃ।
২য় ,,—১৯০৮ খৃঃ।
১৩. বিবি খোদেজার বিবাহ (কবিতা) ১৯০৫ খৃঃ
১৪. হযরত উমরের ধর্মজীবন লাভ (কবিতা) ১৯০৫ খৃঃ
১৫. হযরত বেলালের জীবনী (প্রবন্ধ) ১৯০৫ খৃঃ
১৬. হযরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ (কবিতা) ১৯০৫
১৭. মদীনার গৌরব (প্রবন্ধ) ১৯০৬ খৃঃ
১৮. মোসলেম বীরত্ব (কবিতা) ১৯০৭ খৃঃ
১৯. ইসলামের জয় (প্রবন্ধ) ১৯০৮ খৃঃ
২০. আমার জীবনী (প্রবন্ধ) ১৯০৮-'.০ খৃঃ
২১. বাজীমাত (কবিতা) ১৩১৫ সাল
২২. হযরত ইউসুফ (প্রবন্ধ) ১৩১৫ সাল
২৩. খোতবা ইদুল ফেতর (কবিতা) ১৩১৬ সাল
২৪. বিবি কুলসুম (প্রবন্ধ) ১৩১৬ সাল, ১৯১০ খৃঃ
২৫. ভাই ভাই এইত চাই (প্রহসন)
২৬. ফাঁস কাগজ (প্রহসন)
২৭. একি (প্রহসন)
২৮. টানা অভিনয় (নাটক)
২৯. পঞ্চনারী (পদ্য)

www.pathagar.com

৩০. প্রেম পারিজাত (পদ্য)
৩১. রাজিয়া খাতুন (উপন্যাস)
৩২. তাহমিনা (উপন্যাস)
৩৩. বধূমাতা (উপন্যাস)
৩৪. নিয়তি কি অবনতি (উপন্যাস)
৩৫. গাজী মিয়ার গুলি
৩৬. ইসলামের জয়
৩৭. ইউসুফ জুলেখা

উল্লেখিত গ্রন্থের সবগুলো মুদ্রিত হয়নি। মীর মোশাররফ হোসেন প্রধানত ঔপন্যাসিক হিসাবে পরিচিত হলেও তিনি নাটক, প্রহসন, কবিতা, প্রবন্ধ ও রসরচনা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

তিনি সমাজসচেতন লেখক। সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, অত্যাচার, নিপীড়ন তাঁর লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রথমেই জমিদার দর্পণের প্রসঙ্গে আসা যাক। তৎকালে জমিদারদের প্রজা নিপীড়নের কথা সুবিদিত ছিল। নিঃসহায় জনসাধারণের প্রতি জমিদার গোষ্ঠীর অত্যাচারের সীমাহীনতা তাঁকে ব্যাকুল করে তুলল। এরই প্রতিবিধানের জন্যে তিনি কলম তুলে ধরলেন। জমিদারদের এ অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি তিনি জীবন্ত ভাষায় তুলে ধরলেন 'জমিদার দর্প'ণ নাটকে। এ নাটকখানি জমিদারদের অত্যাচার বিদূরণে অনেকটা সহায়তা করেছে। 'জমিদার দর্পণ' তিন অংকবিশিষ্ট নাটক। সমাজের বাস্তব চিত্র এ নাটকে সুনিপুণভাবে অংকিত হয়েছে। লেখক নিজেই বলেছেন: "নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভালো হয় না। জমিদার বংশে আমার জন্ম। আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমিদার। সুতরাং জমিদারদিগের ছবি অংকিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। সেই বিবেচনায় 'জমিদার দর্পণ' সম্মুখে

www.pathagar.com

ধারণ করিতেছি। যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভালমন্দ বিচার করিবেন ·····।

'বংগদর্শন' পত্রিকায় 'জমিদার দর্পণ' সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "আমাদের বলা কর্তব্য যে, নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে। আমরা প্রজা। তাই জমিদারদের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, আদালতের চিত্রটি পরিপাটি হইয়াছে।" মীর সাহেবের অন্যতম নাটক 'বসন্ত কুমারী।' রোমান্টিক কাহিনীমূলক এ নাটক তিন অংকে বিভক্ত। ইহার সংলাপ ও কাহিনী অত্যন্ত মনোগ্রাহী।"

মীর মোশাররফ হোসেন কবিতা এবং সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর রচিত একটি গানের নমুনা প্রদত্ত হল :

চল মন স্টেশনে, টিকিট কিনে
একবার তারে দেখে আসি।
যার যেখানে হচ্ছে মনে
যাচ্ছে করে হাসি খুশী
তোমরা কি ভাবনা, ঠিক বল না,
ভাবছ কি আর পথে বসি ··

রত্নবতী' মীর সাহেব রচিত উপন্যাস। ইহা একটি উপাদেয় গ্রন্থ।

'বিষাদসিন্ধু' মীর সাহেবের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাংলার বৃহত্তর জনতার কাছে মীর সাহেব জীবনে 'বিষাদসিন্ধু' প্রণেতা হিসেবেই পরিচিত। 'বিষাদসিন্ধু' মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্য-সাধনার স্বর্ণপ্রসূন। ইহা মহরম পর্ব, উদ্ধার পর্ব এবং এজিদবধ পর্ব—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত।

কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনার কংকালের উপর কল্পনার আস্তর সাজিয়ে উপন্যাসখানা সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, জয়নবের প্রতি এজিদের প্রণয়, মুহম্মদ হানিফার যুদ্ধাভিযান ইত্যাদি কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু 'বিষাদসিন্ধু' পাঠ করার সময় পাঠক ঘটনার সত্যমিথ্যা বিচার করার অবসর পান না। আকর্ষণের এক দুর্বার

www.pathagar.com

যাদুমন্ত্রে পাঠক শুধু সামনের দিকে এগিয়ে চলেন। লেখক যখন যুদ্ধের বর্ণনা দেন, বর্ণনার গুণে সমস্ত কারবালা প্রান্তর তখন পাঠকের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠে। আবার যখন করুণ রসের অবতারণা করেন তখন পাঠকও উপন্যাসের চরিত্রের সংগে একাত্ম হয়ে অশ্রু বিসর্জন করেন। 'বিষাদসিন্ধুর' আর এক চমৎকার দিক হচ্ছে তার ভাষা। 'বিষাদসিন্ধুর' ভাষা ফুলের মতই সুন্দর, প্রাঞ্জল ও মাধুর্যময়। সত্যই ' বিষাদসিন্ধুর'' মত গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বিরল।

সুসাহিত্যিক আবদুল লতিফ চৌধুরী বলেছেন : ''বিষাদসিন্ধু সত্যিই ব্যথার দরিয়া—উপক্রমণিকায় বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর শিষ্যবর্গের বিষাদ থেকে আরম্ভ করে জয়নব দর্শনে এজিদের কামনা বিষাদ, কাসেদ মোসলেমের প্রাণবিনাশ তীব্র হলাহল পানে হযরত ইমাম হাসানের মহাপ্রয়াণ, কারবালা ময়দানে ইমাম হোসেনের পুত্রগণসহ আত্মবিসর্জন, কাসেমের শাহাদতপ্রাপ্তি ও সখিনার বিলাপ, মহাপুরুষের ছিন্ন শিরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আজর পরিবারের মর্মান্তিক পরিণাম, সমরবিজয়ী মুহম্মদ হানিফার অদৃষ্ট বিড়ম্বনা এবং নবীন ভূপতিরূপে জয়নাল আবেদিনের মদীনা প্রবেশকালে মহাবীর হানিফার জন্য সকলের বিষাদ, এই বেগবতী বিষাদ-তরঙ্গ হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তোলে, উপন্যাসখানার 'বিষাদসিন্ধু' নামকরণ সার্থক হয়েছে।''

'উদাসী পথিকের মনের কথা' ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসে নীল চাষীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ইহার ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি মনোরম। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' ৪০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক বিরাট উপন্যাস জাতীয় রচনা। গ্রন্থটি অত্যন্ত রসালো। হাসির খোরাক এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়ানো রয়েছে। কেউ কেউ অনুমান করে যে, 'গাজী মিয়ার বস্তানী' বংকিম বাবুর 'কমলাকান্তের দপ্তর-এর অনুকরণে লিখিত। তবে ভাষা ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে এ গ্রন্থখানি 'আলালের ঘরে দুলাল' এবং 'হুতোম পেচার নক্সা'র সঙ্গে

www.pathagar.com

সাদৃশ্য রয়েছে। 'উদাসী পথিকের মনের কথা' উক্ত দুইখানি গ্রন্থের চেয়ে উৎকৃষ্ট

এ পুস্তকের প্রকাশক মনিরুদ্দীন আহমদ বলেন : "কখন, এমন সময় আসিবে যাহারা মুক্ত কণ্ঠে বলিবেন যে, গাজী মিয়া অতীতকালের একখানা বৃহৎ দর্পণের নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন। আরো একটি আশ্চর্য কথা এই যে, বস্তানীর কথা যে শুনিবে, কোন না কোনভাবে সে বলিবেই আমারই কথা লইয়া গাজী মিয়া আপন নথি দোরস্ত করিয়াছেন।" সমগ্র গ্রন্থখানিতে অনাবিল হাস্যরসের যোগান দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ হাস্যরসের মাধ্যমে তিনি সমাজের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কশাঘাত করেছেন। 'গাজী মিয়ার বস্তানি'র পাত্র-পাত্রিগণের নামও অদ্ভুত ধরনের। যেমন—ভেড়াকান্ত, ধামাধরা, লাল আলু মোল্লা ; স্থানের নাম—নেংটিচোরা গ্রাম, খামখেয়ালী গঞ্জ ইত্যাদি। গাজী মিয়ার কতগুলো উক্তি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। যেমন—

(ক) উৎপাত করলে চিৎপাত হবে।

(খ) পুরুষের দশ দশা কখনো হাতী কখনো মশা।

(গ) নূতনে পোড়ে মন, পুরাতনে অযতন।

(ঘ) হক কথায় মানুষ রুষ্ট। বড় মানুষের মুরগী পোষ জরানী মোল্লার মুরগী পোষ।

(ঙ) যখন দেখে আট আটি তখন কেঁদে ভিজায় মাটি, গরম ভাতে অসন্তুষ্ট।

(চ) নিজের পরমায়ু ও পরের ধন মানুষে কখনো কম দেখে না।

মীর সাহেবের অন্যতম গ্রন্থ 'গো-জীবন'। এ গ্রন্থে তিনি গো-রক্ষার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তিতর্ক খাড়া করেছেন। তিনি বলেছেন : "গো-দুগ্ধই আমাদের জীবন।" গো-হত্যার ফলে হিন্দুদের মনে আঘাত দেওয়া হয়। তাই গো-হত্যা বন্ধ করা মহত্ত্বেরই পরিচায়ক—ইহাই তাঁর অভিমত। তিনি লিখেছেন : "খাইবার অনেক আছে ঘোড়া খাইতে পারি, খাই না।

www.pathagar.com

ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ খাইতে গিলিতে পারি, শাস্ত্রের কথায় গিলি না।" তবে এ গ্রন্থে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি অনেক সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত 'গো-জীবন'-কে কেন্দ্র করে তিনি এক মামলায়ও জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। গ্রন্থখানি মীর সাহেবের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'ইসলামের জয়' মীর সাহেবের ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইসলামের আদর্শ ও বিজয় বৈজয়ন্তী যাঁরা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদেরই জীবন ও জীবন-সাধনা তিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে 'ইসলামের জয়' ভাষার পরিপাট্যে, দার্শনিক ভাব কল্পনায়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি পরিবেশনে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের মনে হয় ভাষা, শব্দবিন্যাস, চিত্রপরিকল্পনায় 'ইসলামের জয়' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর অন্যতম।

'আমার জীবনী' মীর সাহেবের বাল্য ও দাম্পত্য জীবনের একখানি মনোরম আলেখ্য। ইহা দশ খণ্ডে বিভক্ত। সহজ সরল ভাষায় জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় তিনি অকপটে বর্ণনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :

"আমার জীবনে শত শত ত্রুটি, শত শত জাহেলী (মুর্খতা) এবং অবিবেচনার কার্য হইয়াছে, তাহার ফল হাতে হাতে পাইয়াছি। সেই সকল বিষয় প্রকাশ হইলে ভবিষ্যতে একটি মানব সন্তানও যদি সাবধান সতর্কে জগতে চলিতে পারেন তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক ও সহস্র লাভ মনে করিব।" 'আমার জীবনী' গ্রন্থটি অত্যন্ত মনোরম।

'বিবি কুলসুম' গ্রন্থটি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী কুলসুমের বিয়োগের পর লিখিত হয়েছে। এ গ্রন্থে কুলসুমের সঙ্গে তাঁর সুমধুর দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। 'বিবি কুলসুম' মীর সাহেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

এতক্ষণ মীর মোশাররফ হোসেনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হ'ল। সাহিত্যের প্রত্যেক শাখায় তিনি শক্তিশালী

www.pathagar.com

লেখনী চালনা করেছেন। সে যুগে মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করে এত বড় সাহিত্যশক্তি অর্জন করা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন ঃ "মীর মোশাররফ হোসেনের দান শুধু বিরাট নয়, বিস্ময়কর। ঊনবিংশ শতাব্দীর তিমিরাচ্ছন্ন দুর্যোগের দিনে তিনিই প্রথম মুসলিম সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বাণীকে শক্তিশালী ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্পপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে তিনি ধীরস্থিরভাবে মিলনের প্রদীপালোক নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।"

বস্তুত মীর মোশাররফ হোসেন আমাদের সাহিত্যকে বন্ধ্যাত্বের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এজন্যে আমরা তাঁর কাছে ঋণী। তিনি আমাদের গৌরবের পাত্র।

www.pathagar.com

সৈয়দ আমীর আলী

ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতীয় মুসলমানদের পতনের যুগ। যে মুঘল সম্রাট ছিল 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা' তাঁর শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গেল সিপাহী বিদ্রোহের পর। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি তাসের ঘরের মত নিয়তির এক ফুৎকারে উড়ে গেল। যে মুসলমান শক্তিসামর্থ্যে শিক্ষা সংস্কৃতিতে ছিল সর্বতোভাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কালক্রমে তারাই 'ঝাঠকাটা পানি টানা'র জাতে পরিণত হল। শাসক হল শাসিত, আমীর হল ফকীর।

বাংলার মুসলমানদের অবস্থা তখন আরও শোচনীয়। জীবনের সর্বপ্রান্তে দেখা দিয়েছে এক হতাশার ম্লান ছবি।

সাহিত্য, যাকে জাতির জীবনীশক্তি বলা যেতে পারে, তার চর্চা থেকে বাংলার মুসলমান হল বিরত। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য মুসলমানদের হাতেই হয়েছে লালিত-পালিত ও বর্ধিত। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা একে চণ্ডালের ভাষা বলে ঘৃণা করত। যারা বাংলা ভাষা চর্চা করত তাদের স্থান 'গৌরব নরক' বলে প্রচার করত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা। এমনকি তাদের অত্যাচারে বাংলা সাহিত্য চর্চাকারীদের জঙ্গলে গুহায় পালাতে হয়েছিল। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নমুনার সন্ধান পাওয়া গেছে নেপালে, এ বাংলাদেশে নয়।

মুসলমানেরা যখন নিজেদের লালিত ভাষাও সাহিত্য চর্চা থেকে বিরত হল তখন হিন্দুরা 'চণ্ডালের' ভাষাকে মাতৃভাষা বলে গ্রহণ করল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সার্বিক চর্চার মাধ্যমে তারা হয়ে পড়ল এ ভাষার দিশারী ও কাণ্ডারী। মুসলমানেরা পড়ে রইল পেছনে। শুধু তাই নয়। বাংলার মুসলমান সব বিষয়ে হিন্দুদের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়ল। দিন দিন হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটা প্রকট হয়ে উঠল। এ প্রসঙ্গে কাজী

www.pathagar.com

মোহাম্মদ ইদ্রিস বলেছেন : ''মুসলমান দিনে কয় ওয়াক্ত নামায পড়ে, এই প্রশ্নের সঠিক জবাব শতকরা কয়জন হিন্দুর কাছে প্রত্যাশা করা যেতে পারে ? উচ্চ শিক্ষিত বিলাত ফেরত দেশবিখ্যাত হিন্দু সাহিত্যিক 'তিনি নেমাজ করতে গেছেন' লিখে মোটেই লজ্জিত হয় না মুসলমানদের দস্তরখান খেতে কেমন ? হিন্দুর মুখে এ প্রশ্ন শুনে হাসি পেলেও এ অতি স্বাভাবিক প্রশ্ন। "সরু সরু করে প্যাঁজ কেঁটে দুধ দিয়ে এমন পায়েশ ঈদের দিনে মুকুলেশ্বরদের (মোখলেছুর) বাড়ীতে রেঁধেছিল যে, তাতে একটুও প্যাঁজের গন্ধ ছিল না," হিন্দুদের মুখে এমনি ধারা বাণী আজও শুনছি এবং হাজার বছর পর ভবিষ্যৎ বংশধরগণও হয়ত শুনবে··· ।''

এভাবে প্রতিবেশী মুসলমানদের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে হিন্দুরা নিজেদের সাহিত্যে যতই এগিয়ে যেতে লাগল মুসলমানগণ ততই অতীত স্মৃতির জাবর কেটে কেটে পিছিয়ে পড়ল। শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমান সমাজ বাঙালী হিন্দুদের হাতে নিজেদের সকল আসন ও অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু অন্ধকার চিরস্থায়ী রইল না। এ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ঘুচাবার জন্য বহু বাঙালী মুসলিম কর্মবীর স্বজাতি সেবায় নিজের জীবন বিলিয়ে দিলেন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে শুরু হল নবজাগরণ। বাংলার মুসলমান সমাজের এই রেনেসাঁ যে সকল মনীষীর ঐকান্তিক সাধনা বলে সূচিত হয়েছিল স্যার সৈয়দ আমীর আলী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে ৬ই এপ্রিল সৈয়দ আমীর আলী উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ইরানের আদি বাসিন্দা ছিলেন। আহমদ আফজল নামক এক ব্যক্তি ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে ইরান থেকে নাদির শাহের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি নাদির শাহের একজন সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন। ভারতবর্ষকে শ্মশান স্তূপে পরিণত করে নাদির শাহ স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু ভারতবর্ষের নয়নভুলানো সৌন্দর্য আফজল খানকে করেছিল আত্মহারা। তিনি ভারতবর্ষের মায়াডোরে বাঁধা পড়লেন। স্বদেশে আর ফিরে গেলেন না, মোগল সম্রাটের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে তিনি ভারতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন।

এই আফজল খানই ছিলেন আমীর আলীর পিতামহ। আমীর আলীর পিতার নাম সাদত আলী খান। তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক শহরে হেকিমী পেশায় রত ছিলেন। সাদত আলী সাহেব সম্বলপুরের শামসুদ্দীন খান নামক এক প্রভাবশালী জমিদারের কন্যার সংগে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। আমীর আলীর পিতা ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। আরবী ও ফারসী ভাষায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিশ্বনবীর জীবনী প্রণয়নে রত ছিলেন। সাদত আলী সাহেবের সংগে কটকে বাংলার শিক্ষা বিভাগের পরিচালক সোয়াট ও উড়িষ্যার বিচারপতি সেলেট সাহেবের পরিচয় হয়। তাঁদেরই পরামর্শে খান সাহেব তাঁর ছেলে আমীর আলীকে ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলতে মনস্থ করেন। তখন কটক ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি অনুন্নত জেলা। সেখানে ইংরেজী শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। সুতরাং সাদত আলী সাহেব কলকাতায় পাড়ি জমান। কলকাতার মাদ্রাসায় বড় তিন ছেলেকে ভর্তি করে দেন কিন্তু কলকাতার পরিবেশ মনোমত না হওয়ায় তিনি স্ত্রী-পরিজন সহ হুগলী গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৮৩৬ সালে হাজী মুহম্মদ মহসিনের বদান্যতায় হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়। সাদত আলী সাহেব উক্ত কলেজে বড় দুই ছেলের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। হুগলী আগমনের অল্পদিন পরেই ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। পিতার মৃত্যুর সময় আমীর আলীর বয়স ছিল সাত বছর।

www.pathagar.com

পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারকে কোন আর্থিক দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। যে স্থাবর সম্পত্তি ছিল তার আয় হতে স্বচ্ছন্দে দিন চলে যেত।

বাল্যকাল থেকে আমীর আলীর বিদ্যাশিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর অন্যতম প্রধান সখ ছিল পাখী শিকার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও কর্মঠ। বন্দুক চালনায় তাঁর জুড়ি ছিল না।

মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি ছয়টি বন্দুকের অধিকারী হন। নিজের বাগানের ফলমূল ও তরিতরকারী বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়ে তিনি বন্দুক ক্রয় করতেন। যখন নিতান্ত বালক তখনই এক উদ্ধতফণা বিষধরকে তিনি দোনালা বন্দুকের সাহায্যে হত্যা করেন। একথা তিনি আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।

শুধু বন্দুক ছোড়া নয়, কুস্তি, গদা ঘুর্ণন এবং অশ্বারোহণে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়।

গৃহ শিক্ষকের নিকট তিনি ভাইদের সঙ্গে আরবী ও ফারসী শিক্ষা করতেন। মৌলভী সাহেবের নিকট তিনি বিখ্যাত ফারসী কাব্যরাজির রসাস্বাদনের সুযোগ লাভ করেন বাল্যকালেই। পাঠাভ্যাসের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল অসাধারণ। তিনি লিখেছেন: "যখন আমার বয়স বার বছর তখন আমি ঐতিহাসিক জীবনের Declire and Fall of the Roman Empire পড়ে ফেলেছি। অবশ্য এ জটিল গ্রন্থ আয়ত্ত করার জন্য একই স্থান বারবার পড়তে হত। রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস আমার নিকট চমকপ্রদ মনে হত। কিন্তু আমি সব চেয়ে বেশী আনন্দ লাভ করি আরব অভ্যুদয়ের কাহিনী পড়ে।"

স্কুলের পাঠ শেষ করে আমীর আলী হুগলী কলেজে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার জন্য ১৫।১৬ বছর বয়সেই তিনি শিক্ষকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। কলেজের অধ্যক্ষ রবার্ট সোয়েইটস তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।

www.pathagar.com

আমীর আলীর জীবনে এই অধ্যক্ষের প্রেরণা এক নবদিগন্তের সূচনা করে। তিনি বলেছেন: "আমার জীবনে যেটুকু সাফল্য লাভ করেছি তার জন্য আমি তিন ব্যক্তির কাছে ঋণী। এঁদের একজন আমার জননী, দ্বিতীয় ব্যক্তি হুগলী ইমামবাড়ার মোতাওয়াল্লী সৈয়দ কেরামত আলী এবং তৃতীয় ব্যক্তি হলেন কলেজের অধ্যক্ষ সোয়েইটস।"

তাছাড়া তিনি রোনাল্ড ককরেল এবং কলেজের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক ব্রেইলসফোর্ডের নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এই ব্রেইলসফোর্ডের সহায়তায় তিনি ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলো পাঠ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি অজস্র পুস্তক পাঠ করেছেন। তাঁর মত একনিষ্ঠ পাঠক এদেশে অতি অল্পই পাওয়া যায়।

আমীর আলী সৈয়দ কেরামত আলীর সান্নিধ্যে মুসলিম দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সৈয়দ কেরামত আলীর 'মঘজই উলুম' নামক বিজ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

আমীর আলী ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে সম্মানের সহিত এণ্ট্রান্স পাস করেন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. এবং ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে ইতিহাসে এম. এ. পাস করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম এম. এ. পাস করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন সৈয়দ আমীর আলী।

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি হুগলী কলেজ থেকে বি. এল. পাস করেন। তাঁর অসাধারণ মেধা দেখে আইন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র বলেছিলেন: 'সময়ে এ ছাত্র বিশেষ উন্নতি লাভ করবে।"

বি. এল. পাস করার পর তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৭১ সালে সরকারী বৃত্তি নিয়ে ব্যারিস্টারী পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি বিলাত গমন করেন।

তথায় তিনি A Critical Examination of Life & Teaching of Muhammad (Sm.) নামক এক চিন্তাগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মুসলমান কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় বিশ্বনবীর জীবনী গ্রন্থ রচনা

www.pathagar.com

ইহাই প্রথম। তাঁর এ গ্রন্থ অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করে। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ বিলাত গমন করেন। সৈয়দ আমীর আলী তথায় স্যার সৈয়দ আহমদের সঙ্গে পরিচিত হন। এ পরিচয় পরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ব্যারিস্টারী পাস করার পর আমীর আলী দেশে প্রত্যাবর্তন করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। আমীর আলী কলকতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান ব্যারিস্টার। অতি অল্পকালের মধ্যেই আইনজীবী হিসাবে তিনি প্রভূত সুখ্যাতি লাভ করেন।

১৮৭৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Fellow নির্বাচিত হন। ১৮৭৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পরবহর ছোটলাট স্যার এলমী কর্তৃক তিনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে আর কে.ন বাঙালী মুসলমান এতগুলো সম্মানজক ও উচ্চপদে অভিষিক্ত হন নি। সৈয়দ আমীর আলীর যোগ্যতা ও অসাধারা দক্ষতাই তাঁকে উপরে টেনে তুলেছিল।

শীঘ্রই তিনি কর্মদক্ষতাগুণে অস্থায়ীভাবে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে প্রমোশন লাভ করেন। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে উক্ত চাকুরী ত্যাগ করে তিনি পুনরায় কলকাত হাইকোর্টে যোগদান করেন।

১৮৭৭ সালে তিনি সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন স্থাপন করে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করেন। তিনি সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর এই সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই সমিতিই ছিল ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে এই সমিতির তরফ থেকে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা চালুর দাবী জানানো হয়। এই দাবীর ভিত্তিতে লর্ড ডাফরীন ১৮৮২ সালে শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন।

১৮৭৭ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য মনোনীত হন।

১৮৮৩ সালে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হন।

www.pathagar.com

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঠাকুর আইনের অধ্যাপকরূপে নিয়োগ লাভ করেন।

১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হন।

জীবনের সুদীর্ঘ ২৮ বছর কাল তিনি হুগলী ইমামবাড়া কমিটির সভাপতি পদ অলংকৃত করেন।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনিই বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম এ গৌরবের অধিকারী হন।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ আমীর আলী নিখিল ভারত শিক্ষা সমিতির সভাপতি পদে বরিত হন।

তৎপর ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি স্থায়ীভাবে বিলাতে বসবাস করেন। বিলাতে গিয়ে তিনি স্বদেশবাসীর কথা ভোলেন নি এবং পূর্বের চেয়ে অধিক উদ্দীপনা নিয়ে স্বজাতির সেবায় মনোনিবেশ করেন।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগ লণ্ডন শাখা প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই তিনি মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার ব্যবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দাবী-দাওয়া পেশ করে উক্ত দাবী-দাওয়া আদায় করেন। নীতিগত কারণে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন।

সৈয়দ আমীর আলীর গৌরবময় জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল পাশ্চাত্য জগতে লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের নীতি ও আদর্শের প্রচার এবং ইসলাম সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ভুল ধারণার অবমোচন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেন Spirit of Islam. হীরক খণ্ড সমতুল্য এ গ্রন্থখানি ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। যুক্তি, তর্ক, ভাষা ও পাণ্ডিত্যের গভীরতায় এ গ্রন্থখানি অপরিমেয় কৃতিত্বের দাবীদার।

www.pathagar.com

The law relating to gifts, trust's testamentary disposition among Mohammedans শীর্ষক তাঁর বক্তৃতামালা দীপ্ত প্রতিভার পরিচায়ক।

আমীর আলীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ The Short History of Saracens প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে। আরব সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এবং আরবীয় শিক্ষা সংস্কৃতি সম্বন্ধে লিখিত এ গ্রন্থখানি এক অমূল্য সম্পদ। তিনি 'ইসলাম' এবং 'Ethics of Islam' নামক পুস্তিকাও প্রণয়ন করেছেন।

আইনের ক্ষেত্রে তিনি রচনা করছেন দুই খণ্ডে বিভক্ত Mohammedan Law নামক মুসলমানী আইন বিষয়ক গ্রন্থ।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর রচিত গ্রন্থ The Personal Law of Mohammedans প্রকাশিত হয়। চার খণ্ডে বিভক্ত হেদায়ার অনুবাদ তিনি উর্দু ভাষায় সুসম্পন্ন করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ As Ashburner's Mortgages।

জাস্টিস উডরকের সহায়তায় তিনি The Law of Evidence. appilcable to British India, Civil Procedure Code ও Bengal Tenancy Act রচনা করেন। আইনের ক্ষেত্রে অপর কোন ভারতীয় মুসলমান এরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হন নি। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে বিপুল পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমীর আলীকে এল. এল. ডি. উপাধিতে বিভূষিত করে।

এক ইংরেজ মহিলার সংগে সৈয়দ আমীর আলীর সখ্যতা জন্মে। উক্ত ভদ্র মহিলাকে তিনি ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে বিবাহ করেন। তাঁর পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখময় হয়েছিল। আমীর আলীর পুত্রগণ ছিলেন পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী তাঁর পুত্র স্যার তারিক আলী কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে বরিত হয়েছিলেন। আমীর আলীর অন্যতম পুত্র ওয়ারিস আমীর আলী ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

www.pathagar.com

সৈয়দ আমীর আলী রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটা তাঁর জীবনে এক বিরাট অবদান। তুর্ক-ইটালী যুদ্ধের সময় এ সমিতি আহতদের সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকে। বলকান যুদ্ধেও এ সমিতি তুর্কীদের সেবাকার্যে অপূর্ব দক্ষতা প্রদর্শন করে। মরক্কো যুদ্ধেও এ সংস্থা আহত সৈনিকদের সেবা করেছে।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ সরকার সৈয়দ আমীর আলীকে প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগের সভ্য নিযুক্ত করে। ভারতবর্ষের অধিবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম এ গৌরব অর্জন করেন।

শুধু নিজ দেশের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন নিখিল বিশ্ব মুসলিমের কল্যাণকামী বন্ধু। 'মুসলমানের এক অঙ্গের ব্যথা সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়'—এ উক্তির যথার্থ রূপায়ণও আমরা সৈয়দ আমীর আলীর জীবনে দেখতে পাই। সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি ছিলেন সতত সচেষ্ট। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে মুসলমানদের বিপদ উপস্থিত হলে তিনি মনে দারুণ দুঃখ অনুভব করতেন এবং নিজের সাধ্যমত সাহায্যের ত্রুটি করতেন না কখনও। ইংরেজ রাজনীতিকগণ যখন ইরানকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়ার জন্য লোলুপ হস্ত প্রসারিত করল তখন আমীর আলী এ হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন।

আমীর আলীর রাজনৈতিক দর্শন ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মুসলমানের দাবী-দাওয়া আদায় করা সম্ভবপর হবে না। সুতরাং মুসলমানদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৭ সালে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' স্থাপন করেন এবং এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার জন্য মহাপ্রাণ স্যার সৈয়দ আহমদকে আহ্বান জানান। কিন্তু স্যার সৈয়দ নীতিগতভাবে এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

www.pathagar.com

স্যার সৈয়দ ইংরেজদের সংগে সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আমীর আলীর প্রতিষ্ঠান ইংরেজ বিরোধী কোন তৎপরতার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এ সত্য যখন উপলব্ধি করতে পারলেন তখন স্যার সৈয়দ নিজ উদ্যোগেই ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে সমধর্মী প্রতিষ্ঠান 'মোহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন।

ক্রমে আমীর আলীর জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা আগস্ট তিনি ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুকালে মৌলানা মোহাম্মদ আলী লণ্ডন অবস্থান করছিলেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ সারা লণ্ডনে এক বিষাদের সৃষ্টি করে। লণ্ডনের বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন। এই মহাপুরুষের তিরোধানে ভারতবাসী তথা বিশ্বমুসলিম এক বিরাট বন্ধুকে হারাল।

সৈয়দ আমীর আলীর চরিত্র ছিল অত্যন্ত মধুর ও উন্নত। তিনি ছিলেন ন্যায়ের সৈনিক এবং দয়ার মূর্ত প্রতীক। তিনি যখন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখনকার দিনের একটি ঘটনার মাধ্যমে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

এক হিন্দু বিধবা আদালতে অভিযুক্ত হয়। তাঁর অপরাধ, তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। অনুসন্ধান শেষে আমীর আলী জানতে পারলেন যে,ঐ বিধবা পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত্যুর ফলে দারুণ সংকটের সম্মুখীন হন। গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায়ান্তর না দেখে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এ ঘটনা শ্রবণ করে আমীর আলীর অন্তর কেঁদে ওঠে। তিনি উক্ত বিধবাকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য মাসিক সরকারী ভাতা মঞ্জুর করেন। সেদিন বিধবা মহিলাটি হাত তুলে যে আশীর্বাদ তাঁকে করেছিলেন হয়ত বা তারই বদৌলতে তাঁর জীবনে গৌরবের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

আইনের ক্ষেত্রে তিনি বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়কে তিনি কখনও অর্থোপার্জনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন নি।

www.pathagar.com

এ নির্লোভ এবং নিষ্কলংক মানুষটি সতত স্বজাতির মঙ্গল প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এক হিন্দু বিবাহিতা যুবতী এক মুসলিম যুবকের প্রণয়ে আসক্ত হয়ে ধর্মত্যাগ করে এবং উক্ত মুসলিম যুবককে বিবাহ করে। এ ব্যাপার নিয়ে হিন্দুরা তুমুল প্রচারণা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তাঁরা কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে মামলা পরিচালনা করল। এ ব্যাপারটি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আত্মমর্যাদা সংরক্ষণের প্রশ্ন দেখা দেয়। আমীর আলী অকুতোভয়ে আসামীর পক্ষে এ মামলা পরিচালনা করে আসামীকে মুক্ত করেন।

তিনি ছিলেন এক বিরাট শিক্ষাব্রতী। তাঁরই উপদেশে প্রভাবিত হয়ে সমাজ হিতৈষীরা করাচী ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

আমীর আলী স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি বিধানকল্পে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

বিশেষত তিনি ছিলেন বাঙালী মুসলমানদের গৌরবস্থল। যে পদ ও সম্মান বাঙালী মুসলমান তথা ভারতীয়দের জন্য ছিল দুর্লভ, আমীর আলীর পক্ষে ছিল তা সহজলভ্য। কর্মসাধনার বলে তিনি নিজের এবং স্বজাতির জন্য গৌরব অর্জন করেছেন। আত্মবিস্মৃত বাঙালী মুসলমানের জাগরণে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। তাই তিনি আমাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্

আমরা এমন এক মহাপ্রাণ সমাজ সংস্কারককে ভুলতে বসেছি, যাঁর কর্মপ্রচেষ্টা বাংলার মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে অপরিসীম প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। যে জাতি অতীতকে ভুলে যায় তার বর্তমানের উদ্যম এবং ভবিষ্যতের সাফল্যও রুদ্ধ হতে বাধ্য। কেননা অতীত হচ্ছে বর্তমানের প্রেরণা এবং ভবিষ্যতের দিশারী। আমরা আজ স্বাধীন। নিজকে আবিষ্কার এবং প্রসারিত করার মাহেন্দ্রক্ষণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। অতীতের খনি থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে অনাগত দিনের সুবর্ণবলাকার হাতছানিতে আমাদের সাড়া দিতে হবে। তাই যাঁরা ছিলেন আমাদের কর্মবীর,আমাদের জাগরণের জন্য যাঁরা তিলে তিলে জীবনপাত করেছেন তাঁদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে এবং জাতির সামনে তাঁদের কীর্তিকলাপ গৌরব ও মর্যাদার সাথে তুলে ধরতে হবে। এরা আমাদের জাতির এক একটি স্তম্ভস্বরূপ। তাঁদের কর্মসাধনা, চিন্তাধারা জনসম্মুখে অবশ্যই তুলে ধরতে হবে। এটা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

বাংলার মুসলিম জাগরণের এমন এক নিবেদিত প্রাণ সংগ্রামী পুরুষ ছিলেন মুন্সী মেহেরউল্লাহ্। দীনহীন অবস্থা থেকে স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টা ও চরিত্রবলে যারা উন্নতির শীর্ষতম শৃঙ্গে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছেন, মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ তাঁদের অন্যতম। আব্রাহাম লিংকন সামান্য শ্রমিকের অবস্থা থেকে আমেরিকার সর্বোচ্চ পদে বরিত হন। আর মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ প্রাথমিক জীবনে দর্জির পেশায় নিয়োজিত থেকেও পরবর্তী জীবনে সমাজ সেবকরূপে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভে সমর্থ হন। মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ ছিলেন একাধারে অসাধারণ বাগ্মী, সমাজ সংস্কারক ন্যায়বান পুরুষ। তাঁর মত সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি মুসলমান সমাজে বিরল। মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ ১২৬৮ বঙ্গীয় (১৮৬১ খ্রীঃ) সালে ১০ই পৌষ সোমবার যশোর

www.pathagar.com

জেলার কালীগঞ্জ, বর্তমানে আলীগঞ্জ, থানার অন্তর্গত ঘোপ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যশোর শহর থেকে ছয় মাইল দূরবর্তী ছতিয়ানতলা গ্রামে তাঁর পিতার বাসভূমি ছিল। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মোহাম্মদ ওয়ারেস উদ্দীন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল, ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান। মাত্র ছ'মাস বয়সে মেহেরউল্লাহ্‌কে তাঁর মাতা ছাতিয়ান তলায় নিয়ে যান। পাঁচ বছর বয়সে তিনি স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তিনি অকালে পিতাকে হারান।

তাই দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় ২য় ভাগ এবং বোধোদয়-এর বেশী বাংলা শিক্ষা লাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র এবং দুই কন্যা নিয়ে তাঁর মাতা মহাসংকটের সম্মুখীন হন। বাধ্য হয়ে তিনি পুত্রের পড়াশোনা বন্ধ করে দেন। কিন্তু ইচ্ছা যেখানে প্রবল বাধা সেখানে তুচ্ছ! মুন্সী সাহেবের জ্ঞান পিপাসা ছিল অপরিসীম। স্বীয় প্রচেষ্টায় তিনি যশোরের 'কচিয়া' নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের নিকট কুরআন শরীফ, পান্দেনামা, গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর কিয়দংশ পাঠ করেন এবং তৎসঙ্গে আরবী উর্দু ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। এই শিক্ষা পরবর্তী জীবনে তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

দারুণ অভাব অনটনের দরুন তাঁকে ঐ বয়সেই চাকুরীর সন্ধান করতে হয়। চাকুরী লাভের আশায় যশোর জিলা বোর্ডের ইংরেজ চেয়ারম্যানের সহিত তিনি সাক্ষাত করেন। নতুন লোক হিসাবে ঐ কাজ তাঁর পক্ষে সমাধা করা সম্ভবপর হবে কিনা প্রশ্ন করা হলে তদুত্তরে তিনি প্রশ্নকর্তাকে উত্তর দিয়েছিলেন "স্যার! আপনার কাজে আপনিও একদিন নতুন ছিলেন। এখন কাজ করে পুরনো হয়েছেন। চাকরী পেলে আমিও আপনার মত অবশ্যই কাজ সমাধা করতে সক্ষম হব।" এ উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে নিয়োগকর্তা তাঁকে মাসিক বিশ টাকা বেতনে চাকরীতে বহাল করেন। কিছুদিন পর এ কার্যে ইস্তফা দিয়ে তিনি

www.pathagar.com

দর্জির দোকান খুলে ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি এ কর্মে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করেন যে, জনৈক ইংরেজ মুন্সী সাহেবকে বেতনভোগী কর্মচারীরূপে নিয়োজিত করেন। এই ইংরেজের সঙ্গে তিনি দার্জিলিং যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তথায় তিনি 'মনসুরে মোহাম্মদী' পত্রিকা এবং 'খ্রীস্টধর্মের ভ্রষ্টতা' নামক পুস্তকটি পড়ার সুযোগ লাভ করেন। এই পুস্তক পাঠের পর তাঁর ধর্মানুরাগী মন ইসলাম ধর্মের প্রতি আরও গভীর-ভাবে আকৃষ্ট হয়।

মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি চান্দুটিয়া গ্রামের অধিবাসী মুন্সী অছিম উদ্দীন সাহেবের কন্যার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মুন্সী সাহেব যখন স্বীয় ব্যবসায়ে রত ছিলেন তখন যশোর অঞ্চলে খ্রীস্টান পাদ্রিগণ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু করেন। তাঁদের রচিত কুৎসায় বিভ্রান্ত হয়ে এবং নানাবিধ প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে অসংখ্য মুসলিম খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। এই সর্বনাশা কাণ্ড দেখে মুন্সী সাহেব বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি অপূর্ব ভাষা ও যুক্তির মাধ্যমে কুৎসা রটনাকারীদের যুক্তি খণ্ডন করতে থাকেন। তখন পাদ্রিগণ হাটে হাটে ধর্ম প্রচার করতেন। মুন্সী সাহেবও তথায় জলদগম্ভীর স্বরে ইসলাম ধর্মের স্বপক্ষে যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করতেন। তাঁর ক্ষুরধার বক্তৃতার সম্মুখে টিকতে না পেরে খ্রীষ্টান পাদ্রিগণ প্রচারকার্য বন্ধ করতে বাধ্য হন। মুন্সী সাহেব জনগণের সম্মুখে ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং মাহাত্ম্য বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করতে থাকেন। বাংলার মুসলমান ইসলাম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাবান হয়ে পড়েন। এভাবে বঙ্গীয় মুসলমানদের যে উপকার তিনি করলেন তা তুলনাতীত।

তিনি ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রচারকল্পে 'ইসলাম ধর্মে জিকা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মুন্সী শেখ আঃ রহিম প্রভৃতি সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ উক্ত সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি জনগণের নিকট সহজবোধ্য ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। ফলে বক্তৃতা তাঁদের কাছে অর্থপূর্ণ ও রসগ্রাহী হতো। নানা গল্পের অবতারণা করে আকর্ষণীয় ভাষায় তিনি বক্তৃতা পরিবেশন করতেন। জনগণ তাঁর বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্বিকার চিত্তে শ্রবণ করত। তখন বাংলার মুসলিম সমাজে মুন্সী সাহেবের বক্তৃতা এক বিরাট আলোড়ন এবং প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। মুখের বাণী যাদুর চাইতেও কার্যকরী, একথা মুন্সী মেহের-উল্লাহ্ বক্তৃতার দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন।

তিনি ইসলাম ও মহানবীর আদর্শ প্রচারকল্পে নদীয়া, যশোর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় বিভিন্ন মিলাদ মাহফিলে এবং সভা সমিতিতে ব্যাপকভাবে বক্তৃতা দিয়ে জাতির এক মহা উপকার সাধন করেন। বঙ্গীয় মুসলমানের শ্রমবিমুখতার প্রতি কঠিন তিরস্কার করে তিনি তাদেরকে স্বাবলম্বী ও ব্যবসামুখী করে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন।

পাদ্রী জন জমিরউদ্দীন 'আসল কোরান কোথায়' নামক এক বিভ্রান্তিকর প্রবন্ধ প্রচার করেন। তদুত্তরে মুন্সী সাহেব 'সর্বত্রই আসল কোরান' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে কুরআনের প্রতি সকল সন্দেহের নিরসন হয় এবং তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করে জন জমিরউদ্দীন মুন্সী সাহেবের প্রতি আকৃষ্ট হন। অকাট্য যুক্তি প্রমাণ এবং ইসলাম ধর্মের সত্যিকার বিশ্লেষণে মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়ে জন জমিরউদ্দীন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই জমিরউদ্দীন সাহেবই পরে একান্ত অনুরক্ত ভক্তের মত মুন্সী সাহেবের ছায়া অনুসরণ করেছেন।

জাতীয় জীবন গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংবাদপত্র জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দিশারী বিধায় ব্যক্তি ও সমষ্টির উপর এর প্রভাব অপরিসীম—এ সত্য মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বাঙালী মুসলমানগণ শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল অনগ্রসর।

www.pathagar.com

স্বভাবতই বাঙালী মুসলমানদের তখন কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র ছিল না। সুতরাং মুসলমান সমাজের মনের অভিব্যক্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাধারা প্রকাশ করার পথ ছিল সীমিত তথা রুদ্ধ। মুন্সী সাহেব এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি তৎকালীন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মিহির' ও সুধাকর'-এর উন্নতি বিধানকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচারকার্য চালিয়ে যান। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে উক্ত পত্রিকার প্রচার ব্যাপক প্রসার লাভ করে। 'মিহির ও সুধাকর' মুসলমান সমাজের চিন্তাধারার সুষ্ঠু রূপায়ণ ও প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করে। বাংলার মুসলিম সমাজকে এই পত্রিকা যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ শুধু পত্রিকা প্রচারেই নিজের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান সম্পর্কে শক্তিশালী লেখনী চালনা করেন। মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেবের 'ইসল ম প্রচার' পত্রিকার তিনি অন্যতম লেখক ছিলেন।

মহতের ব্যক্তিত্ব অন্যান্য ব্যক্তিত্বকেও প্রভাবিত এবং আকর্ষণ করে থাকে—একথা মেহেরউল্লাহ্ সাহেবের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। ঐতিহাসিক রেয়াজুদ্দীন আহমদ, সুসাহিত্যিক শেখ আবদুর রহীম, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রমুখ ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনে মুন্সী সাহেবের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব প্রথম জীবনেই মুন্সী মেহের উল্লাহর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মুন্সী সাহেব সারাজীবন আকরম খাঁকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। একবার মুন্সী সাহেব আকরম খাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন: "তোমরা মাদ্রাসা পাস তরুণ যুবক হয়ে যখন সমাজের কাজে ব্রতী হয়েছ, তখন আমার হৃদয়ে বাস্তবিক অনাবিল আনন্দ ও আশার সঞ্চার হয়েছে। অচিরেই সামাজিক অন্ধকার দূর হয়ে আলোর রেখা দেখা দেবে—সেদিনের আর বিলম্ব নেই।" এ বাক্যগুলি হতে বুঝা যায় সমাজ ও সমাজসেবীদের তিনি কত

www.pathagar.com

ভালবাসতেন এবং তরুণ সম্প্রদায় তথা বাঙালী মুসলিম সমাজকে তিনি কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

তাঁর জীবনের আর এক উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে জনহিতকর কাজ। তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন জেলার মাদ্রাসা, স্কুল ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বাঙালী মুসলমান সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

তিনি জ্ঞানাহরণের জন্য বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক পাঠ করে সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। অনেক দরিদ্র ও উপযুক্ত নবীন লেখকের পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদের 'পরিত্রাণ' কাব্য এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনলপ্রবাহ' কাব্য মুন্সী সাহেবের খরচেই মুদ্রিত হয়েছে।

মুন্সী সাহেব শুধু সমাজসেবকই ছিলেন না; তাঁর সাহিত্য-প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। 'দেবলীলা', 'তর্কযুদ্ধ', 'জোয়াবোন নাসারা', 'হিন্দু ধর্ম রহস্য', 'রদ্দে খ্রীস্টান', 'খ্রীস্ট ধর্মের অসারতা', 'সাহেব মোসলমান', 'মেহেরুল ইসলাম' প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ। এসব পুস্তকে তিনি সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ করে ত্রুটিমুক্তির পথনির্দেশ করেন। 'দলিল অল ইসলাম' নামক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করার পূর্বেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি পারস্যের অমর কবি শেখ সাদীর 'পান্দেনামা' কাব্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করেন। তাঁর রচিত 'বিধবা গঞ্জনা' ও 'হিন্দু ধর্ম রহস্য' প্রভৃতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর জীবিতকালে উক্ত গ্রন্থদ্বয় বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। অত্যল্পকাল মধ্যে দুটি গ্রন্থেরই অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় মুন্সী সাহেবের সাহিত্য-প্রতিভা কত তীক্ষ্ণ ছিল।

ফলের ভারে বৃক্ষ নত হয়। ফলভারানত বৃক্ষের মতই মুন্সী সাহেব ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। প্রচুর সুযশ ও সুখ্যাতি লাভে সমর্থ হয়েও তিনি কখনও উদ্ধত মনোভাবের পরিচয় দেন নি। একটি সভার সভাপতিরূপে

www.pathagar.com

তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "শকট পরিচালক শকটের উপর বসে থাকে। কিন্তু ভিতরের আরোহী কি শকট চালক অপেক্ষা অধিক সম্মানী নয়?"

তিনি ছিলেন ধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত। ইসলামকে তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। বাঙালী মুসলমানদের খ্রীস্টান পাদ্রীর কবল থেকে মুক্ত করার যে প্রচেষ্টা তিনি চালিয়েছিলেন, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহানবীর প্রতি তিনি অগাধ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নবীর উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর নিম্নলিখিত নাতগুলো বহুল প্রচারিত ছিল:

১। গাওরে মুসলমানগণ নবীগুণ গাওরে
পরান ভরিয়া সবে ছল্লে আলা গাওরে।

২। আপন কালামে নবীর সালামে তাকিদ করেন বারী
কলবেতে জান কহিতে জবান যে তক থাকেন জারী।

একবার এক পাদ্রী মুন্সী সাহেবকে বলেছিলেন, "আমাদের যীশু আপনাদের নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা ইসলামের নবী মদীনার মাটির নীচে সমাধিস্থ আর আমাদের নবী সশরীরে বেহেশতে গমন করেছেন।" তদুত্তরে মুন্সী সাহেব দিয়েছিলেন দাঁতভাঙা জবাব, "ব্যাপার যদি তাই হয়ে থাকে তবে আমাকে এ কথাই বলতে হচ্ছে যে, হাল্কা ও অন্তঃসারশূন্য বস্তু স্বভাবতই উপরের দিকে উত্থিত হয় আর ওজনবিশিষ্ট বস্তু মাটিতে স্থান লাভ করে। এ কথাও সত্য যে, আমাদের নবী তাঁর উম্মতদের ভালবাসেন। তাই তিনি উম্মতদের ফেলে একেলা বেহেশতে গমন করেন নি। তিনি আমাদের গুনাহ্ মাফ করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে বেহেশতে যাবেন।"

মহানবীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাই তাঁর মনে এ ধরনের অকাট্য যুক্তির অবতারণা করেছিল।

তাঁর রচিত 'মেহেরুন এসলাম' ও 'বড় মিয়ার নকল গ্রন্থ' পাঠ করে কত মুসলমান যে স্বীয় ধর্মে আস্থাশীল হয়েছিল তার কোন ইয়ত্তা নেই।

www.pathagar.com

১২২৮ সালে ফিরোজপুরে খ্রীস্টানদের সঙ্গে তিনদিন ব্যাপী এক তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ক্ষুরধার যুক্তির সাহায্যে তিনি খ্রীস্টান মিশনারীদের পরাজিত করে ইসলাম ধর্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই তর্কযুদ্ধের বিবরণ 'খ্রীস্টান-মুসলমানে তর্ক যুদ্ধ' নামক পুস্তকে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ইসলামের আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি বাংলা ও আসামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছিলেন।

ধর্ম নিয়ে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল নিরসনেও তাঁর চেষ্টা অশেষ ফললাভ করেছিল। একবার কেশবপুর অঞ্চলে হানাফী-মুহম্মদী জামাতের মধ্যে মযহাব নিয়ে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। উভয় পক্ষের সমর্থক প্রধান প্রধান বক্তাগণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে সমবেত হন। তাঁরা কিছুতেই সমঝোতায় পৌছাতে সক্ষম হলেন না। ক্রমে এই তর্ক উগ্র মূর্তি ধারণ করে। এই অস্বস্তিকর পরিবেশে মুন্সী সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। ভেদনীতি ইসলামের পরিপন্থী, এ কথা তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। ক্রমে জনতা শান্ত মূর্তি ধারণ করে। মুন্সী সাহেবের মুখের ভাষায় দলাদলি কোলাকুলিতে পরিণত হল। মুন্সী সাহেবের বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ। তাঁর ভাষায় ছিল এক সম্মোহনী শক্তি। মুগ্ধ শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত নিশ্চুপভাবে তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করত। দূর-দুরান্ত থেকে শ্রোতা এসে তাঁর সভায় ভিড় জমাত। তিনি চার-পাঁচ ঘন্টা অনর্গলভাবে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে পারতেন। ভাষার মাধুর্য, লালিত্য এবং মার্জিত রুচির জন্য হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁর বক্তৃতা উৎসাহের সঙ্গে শ্রবণ করতেন। তাঁর বক্তৃতার যাদুকরী প্রভাব সকল শ্রেণীর শ্রোতার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করত। শুধু বক্তৃতা নয়, হাস্য-কৌতুক এবং বাকপটুতায়ও তাঁর ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। একদিন এক হিন্দু ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "গো-মাংস আহার করা কি বিধেয়?" উত্তরে মুন্সী সাহেব বলেছিলেন, "কেন নয়? গোবর ভক্ষণে যদি হিন্দুর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত

www.pathagar.com

হতে পারে, তবে মুসলমান গো-মাংস ভক্ষণ করলে তাঁর সমস্ত জীবনের পাপ মোচন হবে না কেন ?"

বিপদগ্রস্তের দুঃখ মোচনে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। পরের দুঃখ সংকটে তাঁর মন বেদনায় আপ্লুত হয়ে যেত। নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি অন্যের সাহায্যার্থে ছুটে যেতেন। একবার গ্রামের একটি বালক কূয়ার মধ্যে পতিত হয়। মুন্সী সাহেব দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কুয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তিনি অসহায় বালককে উদ্ধার করেন।

যশোরের হাটে এক অন্ধ বৃদ্ধ মাটির প্রদীপ জ্বেলে তামাক বিক্রয় করত। একদিন এক দুষ্ট লোক প্রদীপটি নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর অন্ধ তা জানতে পেরে আকুলভাবে কেঁদে ওঠে। বৃদ্ধের কান্না শুনে মুন্সী সাহেব বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি নিজের খরচে প্রদীপ ক্রয় করে বৃদ্ধকে দান করলেন। বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটে উঠল। এইভাবে মুন্সী সাহেব বাংলার মুসলমানদের মুখে হাসি ফোটানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

মেহেরউল্লাহ্ সাহেব ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। একনিষ্ঠ ইসলামের সেবক হলেও হিন্দু এবং খৃস্টানগণ তাঁকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। মহৎ ব্যক্তিরা সর্বদা মত, পথ ও জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হন।

স্যার সৈয়দ আহমদের সংগে মুন্সী মেহেরউল্লাহ্র কর্ম ও চিন্তাধারার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। স্যার সৈয়দ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন, মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ও বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রভূত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও উভয়ের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ হিন্দু-মুসলমানকে ভারতের দুই নয়ন তারা বলে উল্লেখ করলেও মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান কবতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা

www.pathagar.com

কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান। তাই উক্ত প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটা সম্ভবপর ছিল না।

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। সমাজ-সংস্কারক হলেও রাজনীতিকে তিনি উপেক্ষা করতেন না। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে হিন্দু সমাজে মহা-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। উক্ত আন্দোলনে যোগদান করার জন্য হিন্দু জননায়কগণ তাঁকে অনুরোধ জানান। কিন্তু উক্ত আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছিলেন, "একখানি ভগ্ন ও অপর একখানি সবল পা নিয়ে যেমন পথচলা দুষ্কর, তদ্রূপ যতদিন মুসলমান জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় হিন্দুর সমকক্ষ হতে না পারবে ততদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর অনুসরণ ও প্রতিযোগিতা করতে যাওয়া মুসলমানদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।" উপরোক্ত উক্তি থেকেই স্যার সৈয়দের মত মুন্সী সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌ ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী ও বিনম্র। অত্যন্ত সাদামাটাভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন। বিলাস ব্যসনের মোহ তাঁকে কখনো আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাঁর সুস্থ সবল দেহ, শান্ত সুন্দর চেহারা ও অনাড়ম্বর জীবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। পরদুঃখ মোচনে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। দরিদ্রের অভাব মোচনের জন্য তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। তাঁর দয়ার ফলে অনেক দরিদ্র ছাত্র বিনা-বেতনে বিদ্যার্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নিজ বাড়ীতে তিনি বহু ছাত্রের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তার বাড়ীখানা ছিল একটি ক্ষুদ্র এতিমখানা বিশেষ। এ ব্যাপারে তাঁর মহত্ত্ব হাজী মুহম্মদ মুহসীনের সঙ্গেই তুলনীয়। বস্তুত মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র সমগ্র জীবন একটি প্রস্ফুটিত ফুলের মতই সুরভিত ও মনোহর। যৌবনে মুন্সী সাহেবের স্বাস্থ্য অটুট ছিল। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম হেতু তিনি আহার-বিহারের সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করতে পারেন নি। ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। উত্তর বঙ্গে

www.pathagar.com

একদিনে তিনবার সভা করে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। জর নিয়ে মুন্সী গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। জ্বর ক্রমে নিউমোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়। এই দুরন্ত রোগেই দেশগত প্রাণ মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ (১৯০৭ খৃঃ) বাংলা ১৩১৪ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে সারা বঙ্গে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুর সময় তিনি বৃদ্ধা মাতা, দুই স্ত্রী, তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রেখে যান। মুন্সী সাহেব ছিলেন মাতার একমাত্র সন্তান। পুত্রের অকাল মৃত্যুতে শোকাভিভূতা জননী ভেঙে পড়েন। চার বছর পর তাঁর মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুন্সী সাহেবের প্রথম পুত্র মনসুর আহমদ দেহত্যাগ করেছেন। দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ মোহসেন বি. এস. সি. পরীক্ষা পাস করে সাব-ডেপুটি কালেক্টরের চাকুরী গ্রহণ করেন।

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ স্বজাতির জন্য সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন। কিন্তু জাতি আজ তাঁকে ভুলতে বসেছে। তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা হয়নি। শুধুমাত্র তাঁর বাড়ীর নিকটে যশোর-দর্শনা লাইনের ষ্টেশনটির নাম 'মেহেরউল্লাহ্ নগর' রাখা হয়েছে। মুন্সী সাহেবের কবর ষ্টেশনটির নিকটেই অবস্থিত। ফাল্গুন মাসের পুর্ণিমায় তিন দিন হাজার হাজার জনতা তাঁর দরগায় যিয়ারত করে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। তাঁর গ্রন্থগুলো এখন দুষ্প্রাপ্য। সেগুলো সংগ্রহ করে পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। রাস্তা ও বিশ্ববিদ্যালয় হল প্রভৃতি জনহিতকর কার্যের সঙ্গে তাঁর নাম বিজড়িত করা কর্তব্য।

পরিশেষে তাঁর সুষ্ঠু চিন্তাধারা, মহৎ কর্মপ্রচেষ্টা ও জনসেবার আদর্শ দেশবাসী নিজের মনে গ্রহণ করতে পারলে মুন্সী মেহেরউল্লাহ্র সাধনা সার্থক হবে এবং এর মাঝেই তিনি চিরজীব হয়ে থাকবেন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন

ইংরেজের দমননীতি, সাম্রাজ্য হারানোর অন্য আত্মাভিমানজনিত ক্ষোভ ও বাঙালী হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের সুদূরপ্রসারী ফল হিসাবে বাঙালী মুসলমান সমাজ ইংরেজী শিক্ষাকে বর্জন করে। ফলে বাংলার মুসলমান সমাজ বাঙালী হিন্দুদের চেয়ে শোচনীয়ভাবে পশ্চাদপদ হয়ে পড়েছিল। শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজদের আনুকূল্য লাভ করে হিন্দুরা যতই অগ্রসর হতে থাকে, মুসলমান সমাজ ততই পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষার অভাবে বাঙালী মুসলমান স্বভাবতই সাহিত্য-চর্চা থেকে বিরত থাকে। কাজেই তখন মুসলমান সাহিত্যিকের অভাব নিদারুণভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে। মুসলমানগণ সাহিত্যক্ষেত্রে কোনরূপ ভূমিকা পালন করতে পারে, এটা ছিল হিন্দুদের ধারণা বহির্ভূত। মুসলমানদের অনীহা ও অনগ্রসরতাই হিন্দুদের এ ধারণার জন্ম দিয়েছে।

এরূপ লজ্জাকর দুর্দিনে সাহিত্যক্ষেত্রে শক্তিশালী লেখনি চালনা করে যাঁরা মুসলিম সমাজের সম্ভ্রম রক্ষা করেন, ঔপন্যাসিক মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন তাঁদের অন্যতম। ভাষার প্রয়োগ, বর্ণনা-ভঙ্গি ও রচনাশৈলীর গুণে তিনি একজন সত্যিকার সাহিত্যিকের গুণ অর্জন করেন। তাঁর রচনা অনুকরণ দোষে দুষ্ট নয়। মুসলমান সমাজের আদর্শ রুচি ও জীবনবোধ তাঁর রচনায় মনোরমভাবে অংকিত হয়েছে। মুসলমান সমাজের সমস্যা, জীবন-পদ্ধতি ও মানসিকতা তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এটা তাঁর মনীষা ও সমাজকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখার ফল। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙালী মুসলমানদের জীবনে সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে তিনি যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন, তার মূল্য অপরিসীম। বাংলার মুসলমান সমাজ তাঁর কাছে গভীরভাবে ঋণী।

www.pathagar.com

রুচিবান সাহিত্যিক মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে পাবনা জেলার অন্তর্গত চরবেলতৈল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর জন্মস্থান ও কাল সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ডঃ মুঃ এনামুল হকের মতানুসারে সাহিত্য-রত্নের জন্মসাল ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ। ডঃ গোলাম সাকলায়েন সাহিত্য-রত্নের পুত্রের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিবরণে জানতে পেরেছেন যে, তাঁর জন্মকাল ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ সুতরাং মরহুমের পুত্রের নিকট প্রাপ্ত তথ্য সঠিক বলে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। যাই হোক, সাহিত্য-রত্ন সাহেব সম্ভ্রান্ত মীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ জয়েনউদ্দীন আহমদ। তাঁর পিতার অন্য ভাইয়ের নাম মোহাম্মদ ময়েন উদ্দীন আহমদ। নজিবর রহমানের মাতা সোনাভান এবং পিতা উভয়েই অত্যন্ত ন্যায়বান ও ধার্মিক ছিলেন। বিদ্যার প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল অত্যন্ত অনুকূল। তবে তাঁদের আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না।

নজিবর রহমান চারবার দার পরিগ্রহ করেন। পুত্র-কন্যাদের মধ্যে মীর মোহাম্মদ হবিবর রহমান, আমিনা খাতুন, মীর মোহাম্মদ গোলাম বত্ত, জাহানারা, ছিরতুন্নেছা ও মমতাজ মহলের নাম জানা গিয়েছে উল্লেখিত পুত্র-কন্যাদের কেউ কেউ এখনও জীবিত রয়েছেন।

সাহিত্য-রত্ন সাহেব বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত শান্তশিষ্ট স্বভাবের ছিলেন। প্রথমে তিনি স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হন। তথায় তিনি বাংলা শিক্ষা লাভ করেন এবং স্বীয় উদ্যমে আলেমের নিকট আরবী ও ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। নজিবর রহমানের যখন ছাত্রাবস্থা তখন মুসলমান সমাজ সবেমাত্র ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা তাঁর পক্ষে সহজলভ্য ছিল না। তবে তাঁর চাচা অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে বলীয়ান হয়ে পণ্ডিত সাহেব বাল্যে বিদ্যাশিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই চাচার নামেই পরবর্তীকালে তার 'গরীবের

www.pathagar.com

মেয়ে, নামক উপন্যাস গ্রন্থখানি উৎসর্গকৃত হয়। এই চাচার হাতেই তিনি সাহিত্য সাধনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। গ্রামের স্কুল হতে তিনি ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। এ সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু স্বীয় কর্মোদ্যম বলে তিনি নর্মাল পরীক্ষায় পাস করেন। এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েই সাহিত্য-রত্নের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে বেশীদূর অগ্রসর হতে সক্ষম না হলেও তিনি বাংলা ভাষায় গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর রচনাবলীই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করার পর তিনি সংসার জীবনে পদার্পণ করেন। ৬২ বছর বয়সে তিনি স্বগ্রাম নিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ ঈসমাইল হোসেনের কন্যা সাহেরা বানুর সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। সাহেরা বানু ওরফে সাবান বিবি বিবাহের সাত বছর পর জান্নাতগামী হন। এরপর কুড়িগ্রামের সৈয়দ বংশে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করেন।

১৯১২ সালে নূরজাহান নাম্নী এক স্কুল ছাত্রীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে উক্ত ছাত্রীর পিতার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠান। কিন্তু মেয়ের পিতা প্রৌঢ়-বয়স্ক সাহিত্য-রত্নের সাথে কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তিনি মর্মাহত হয়ে নূরজাহানের সহপাঠিনী রহিমা খাতুনকে চতুর্থ পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া স্ত্রী জীবিত ছিলেন না। বয়সের যথেষ্ট তারতম্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর চতুর্থ তথা শেষ দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের হয়েছিল। স্ত্রীর নিকট হতে তিনি শেষ বয়সে সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করেছিলেন।

সাহিত্য-রত্ন সাহেব শিক্ষকতার মাধ্যমেই জীবিকার্জন করতেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন আদর্শ, সৎ ও পরিশ্রমী। সিরাজগঞ্জের এক মডেল ছাত্রবৃত্তি স্কুলে তিনি সর্বপ্রথম প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন ছিল অতীব প্রশংসনীয়। এ সময় তিনি পোস্ট মাস্টার রূপে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। অতঃপর তিনি এক

www.pathagar.com

সার্কেল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে বরিত হন। তৎপর তিনি পাবনা জেলার মলঙ্গা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজে যোগদান করেন। নজিবর রহমান সাহেবের শিক্ষকতা ছিল গৌরবময় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জ্ঞান বিতরণকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

নজিবর রহমান শুধু শিক্ষকতা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, সমাজের প্রতি তাঁর সেবাদৃষ্টি সর্বদা নিয়োজিত থাকত। মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের অহেতুক শত্রুতা তিনি তীক্ষ্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর মুসলমানদের প্রতি হিন্দুর প্রত্যক্ষ বিরোধিতাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। হিন্দু এবং ইংরেজের এই সম্মিলিত মুসলিম বিরোধী মনোভাব দেশদরদী নজীবর রহমানের প্রাণকে ব্যথিত করে তোলে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ তাঁর মনের দুয়ারেও প্রচণ্ডভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সমাজ সচেতন ও সংবেদনশীল নজিবর রহমান এ সকল আন্দোলন উপলক্ষ করে 'বিলাতী বর্জন রহস্য' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন।

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বকীয়তা, শিক্ষা, সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে যে অধিবেশন বসে, নজিবর রহমান তাতে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন এবং সেই অধিবেশনে নিজ এলাকার মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের অকথ্য অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে এক তেজস্বী বক্তৃতা দান করেন। অধিবেশন থেকে নিজ এলাকায় ফিরে তিনি সমাজসেবামূলক কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মুসলিম জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

নজিবর রহমান সাহেব অন্যায়ের সামনে ছিলেন অকুতোভয়। জীবন বিপন্ন করেও তিনি সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

www.pathagar.com

তখন পাবনা জেলার তাড়াশ নিবাসী হিন্দু জমিদারগণ মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে তারা বাধা প্রদান করত। গো-কুরবানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবীর বিরোধিতার জন্য নজিবর রহমান অন্যান্য সমাজসেবীদের সহায়তায় 'আঞ্জুমান-ই ইসলাম' নামক এক সমিতি গঠন করেন। সমিতি কর্মীদের শায়েস্তা করার জন্য দুরাত্মা জমিদার এক দস্যুকে নিয়োজিত করে। এই দস্যু নজিবর রহমানকে হত্যা করার চেষ্টায় রত থাকে। জীবনের এই সংকটময় মুহূর্তে তিনি এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। এই সভায় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবসমূহ সরকারের নিকট পেশ করা হয়। ইহার ফলস্বরূপ হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার নির্যাতন অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। কিন্তু জমিদারদের রোষদৃষ্টি তিনি এড়াতে পারেন নি। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র অবগত হয়ে তিনি স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হন। এ সময়ে তিনি হাটিশ কুমরুল গ্রামে বিদ্যালয় ও বসতবাটি স্থাপন করে জনসেবামূলক কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর দান অপরিসীম। শিক্ষা বিস্তারের ন্যায় মহতী কাজে তিনি আজীবন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি চরবেলতৈলে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যে যুগে মুসলমান সমাজে পুরুষেরাই ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে শোচনীয়ভাবে পশ্চাদপদ, সে যুগে অজগাঁয়ে আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন কম গৌরবের বিষয় নহে।

এতক্ষণ সাহিত্য-রত্নের জীবনের অন্যান্য দিক আলোচনা করা হল। কিন্তু তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সাহিত্য সাধনা। এই সাহিত্যের মাধ্যমেই তিনি বাংলাদেশে অমর হয়ে আছেন।

বাংলার মুসলমানদের তমসাচ্ছন্ন যুগে তিনি যে সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন, সত্যিই তা এক বিস্ময়ের বিষয়। নিজের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শকে তিনি পরিপূর্ণরূপে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছেন। উপন্যাসের মাধ্যমে আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি মুসলমানদের

www.pathagar.com

উদ্বোধিত করার প্রয়াস পান এবং সেক্ষেত্রে তিনি অশেষ সফলতা অর্জন করেন। পল্লীর মানুষের প্রেম, ভালবাসা, ঈর্ষা, ব্যথা, বেদনা, কুসংস্কার সবই তাঁর রচনায় উজ্জলভাবে ফুটে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে মিশে তিনি মানুষের অন্তরের কথা আহরণ করেছেন এবং লেখনীর মাধ্যমে তা প্রজ্জ্বল-ভাবে ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্য জীবনে তিনি অগ্নিপুরুষ ইসমাঈল হোসেনের নিকট প্রেরণা লাভ করেন।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মতই তিনি মানব চরিত্রের দুর্গম কন্দরে প্রবেশ করে অন্তরের রহস্য উদঘাটনে পারদর্শী ছিলেন। বর্ণনার মাধুর্য এবং কাহিনীর লালিত্যের গুণে তাঁর উপন্যাস অপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি পাঠকদের ইসলামী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য তিনি সাহিত্য-রত্ন উপাধিতে ভূষিত হন।

যতদূর জানা যায়, নজিবর রহমান বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৪ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর প্রকাশিত ৯ খানি ও অপ্রকাশিত ২ খানি গ্রন্থ ব্যতীত অপর তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'বিলাতী বর্জন রহস্য' ও 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' সুধী জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'আনোয়ারা' নজিবর রহমান সাহেবের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 'আনোয়ারা' রাজশাহীতে রচিত। ১৯১৪ সালের ১৮ই মে 'আনোয়ারা' প্রকাশিত হয়। উপন্যাস-খানির প্রথমে অন্য নাম দেয়া হয়েছিল। আফসার উদ্দীন ইহার 'আনোয়ারা' নামকরণ করেন। তিনি এই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের নামও পরিবর্তন করেছেন। রাজশাহী জুনিয়ার মাদ্রাসার ছাত্রগণ উক্ত গ্রন্থের মুদ্রণের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। পাণ্ডুলিপিতে উপন্যাসটির অনেক দোষত্রুটি ছিল। ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ, মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোজাম্মেল হক প্রমুখ সাহিত্যসেবী পুস্তকখানি যথাসাধ্য সংশোধন করে দেন।

www.pathagar.com

মীর মোশাররফ হোসেনের প্রণীত 'বিষাদসিন্ধু' ব্যতীত বাঙালী মুসলমানদের রচিত আর কোন উপন্যাস এত অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। 'আনোয়ারা'-র জনপ্রিয়তা এখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। কতক বছর পূর্বে এই উপন্যাসখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে এবং হাজার হাজার দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমেই তিনি বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পরিচিত। উপন্যাসখানি যখন প্রকাশিত হয়, তখন চতুর্দিকে অভূতপূর্ব এক সাড়া জাগে। কারণ মুসলমানদের হাতে এমন প্রাঞ্জল ভাষায় এত সুন্দর উপন্যাস রচিত হতে পারে, তা হিন্দুদের ধ রণা ছিল না। 'আনোয়ারা' প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁরা সত্যিই বিস্মিত হলেন। পঞ্চানন নিয়োগী 'আনোয়ারা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "মুসলমান পল্লী সমাজের একটি সুন্দর চিত্র উপন্যাস-খানিতে দেখিতে পাইলাম। বিশেষত, আনোয়ারা চরিত্রটি খুবই সুন্দর হইয়াছে। আপনার উপন্যাসখানি জনসমাজে আদৃত হইলে বিশেষ সুখী হইব।"

'আনোয়ারা' আদর্শভিত্তিক উপন্যাস। গ্রন্থকার এই আদর্শের ইঙ্গিত গ্রন্থের ভূমিকাতে নিম্নলিখিত ছন্দের মাধ্যমে দিয়েছেন :

সতীর সর্বস্ব পতি,
সতী শুধু পতিময়,
বিধাতার প্রেম রাজ্যে
সতত সতীর জয়।

'আনোয়ারা' বৃহৎ মুসলিম সমাজের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন ত্রুটি তিনি সুনিপুণভাবে এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। সমাজের মনের কথা প্রকাশ পেয়েছিল বলেই গ্রন্থখানি এত সমাদর লাভ করেছে। এ পর্যন্ত পুস্তকটি ২ লক্ষের অধিক কপি বিক্রয় হয়েছে। এরূপ বিরল জনপ্রিয়তা বাংলা সাহিত্যের আর দু'একটি পুস্তকের ভাগ্যে জুটেছে কিনা সন্দেহ।

www.pathagar.com

'গরীবের মেয়ে' ও 'প্রেমের সমাধি' নজিবর রহমানের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস। 'গরীবের মেয়ে' গ্রন্থে তিনি মুসলমান রমনীর চরিত্রাদর্শ মধুরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বইখানি সম্বন্ধে লেখক নিজেই বলেছেন, "এ গ্রন্থে আছে কেবল পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মেয়েদের সুশিক্ষার কথা ও তাহাদিগকে লইয়া অবিচিত্ররূপে সুখ-শান্তির সহিত ঘরকন্না করিবার কথা।"

সাহিত্য-রত্নের আর একখানি গ্রন্থের নাম 'দুনিয়া আর চাই না।' পুস্তকখানি পাঁচটি ছোট গল্পের সমষ্টি। ইহা ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ঔপন্যাসিক নজিবর রহমান যে ছোট গল্প রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন, পুস্তকখানি তারই উপযুক্ত প্রমাণ।

'চাঁদ তারা বা হাসান গঙ্গা বহমনি' তাঁর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। সরস প্রেমের কাহিনী নিয়ে গ্রন্থটি রচিত। এই উপন্যাসের ভাষা অত্যন্ত মধুর ও প্রাণস্পর্শী, কিন্তু বংকিম প্রভাবিত।

এছাড়া 'পরিণাম', 'মেহেরুন্নেছা' এবং 'বেহেশতের ফুল' নামক গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। নজিবর রহমানের সব গ্রন্থই রসোত্তীর্ণ হয়তো নয় কিন্তু বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকদের পথিকৃত হিসাবে তিনি ও তাঁর গ্রন্থসমূহ অবশ্যই চিরকাল সমাদর পাবে।

নজিবর রহমান ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক। তিনি অতীব নিষ্ঠার সংগে ধর্ম পালন করতেন। তাঁর পারিবারিক জীবন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর ছিল। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই অক্টোবর (বাংলা ১৩৩০ সাল, ১লা কার্তিক) ৬৩ বছর বয়সে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেন। বাড়ীর এক কোণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

নজিবর রহমানের সাহিত্য-প্রতিভা সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। গতানুগতিক পরিবেশের উর্ধ্বে উঠে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন

www.pathagar.com

তা চিরদিন আমাদের প্রেরণা যোগাবে। পাশ্চাত্য আলোকস্নাত হিন্দু সাহিত্যিকেরা উন্নত রস ও রুচিসম্মত বাংলা সাহিত্য যখন সৃষ্টি করছেন, বাঙালী মুসলমান তখনও বাস্তবকে স্বীকার করতে পারেন নি, তখনও তারা দোভাষী পুঁথি-সাহিত্য সৃজনেই ব্যস্ত কিন্তু নজিবর রহমান ব্যতিক্রম। তিনি বাস্তবকে স্বীকার করতে পেরেছিলেন এবং বিশুদ্ধ ভাষায় রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এখানেই নজিবর রহমান সাহেবের সার্থকতা ; এখানেই তিনি সৃষ্টি-গৌরবে দেদীপ্যমান।

www.pathagar.com

মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ

বাঙালী মুসলমানদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচেষ্টা যাঁদের জীবনের ব্রত ছিল, অন্ধকার মুসলিম সমাজে আলো জ্বালাবার কৃতিত্ব যাঁদের প্রাপ্য, মুন্সী রেওয়াজুদ্দীন আহমদ তাঁদের অন্যতম। তখনকার দিনে মুসলিম সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কৃষ্টি, ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা সর্ববিষয়ে মুসলমানগণ পিছিয়ে পড়েছিল। এই মৃতপ্রায় সমাজকে পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে রেয়াজুদ্দীন আহমদের অবদান অত্যন্ত মূল্যবান।

অনেকে মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ ও রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ মাশহাদী একই ব্যক্তি বলে ভুল করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দুই ব্যক্তি। মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ যখন রূপসা ছেড়ে কলকাতা গমন করেন, তখন তাঁর সংগে পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর পরিচয় ঘটে। রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী ছিলেন কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। কলকাতায় রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ মীর্জাপুর ৬৪ নং ওল্ড বৈঠকখানা রোডে থাকতেন এবং রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী থাকতেন আন্তনী রোডে। কাজেই এই দুই কীর্তিমান ব্যক্তিকে একই ব্যক্তি মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অহেতুক।

মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ ১২৬৯ বাংলা সালে বরিশাল শহরের কাউনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মায়জুদ্দীন আহমদ। অতি অল্প বয়সেই তিনি মাতাপিতাকে হারান।

নানা বাধা-বিপত্তির জন্য তিনি বিদ্যাশিক্ষায় বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। পিতার মৃত্যুর পর শেরে বাংলার পিতৃব্যের দয়ায় তিনি বরিশালের বাংলা স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। পরে তাঁর আত্মীয় এবং রূপসা গ্রামের জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ গাযীর

www.pathagar.com

নিকট তিনি আশ্রয় লাভ করেন। এখান থেকেই তিনি ছাত্রবৃত্তি পাস করেন এবং আরবী ফারসী ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রবৃত্তি পাস করার পর তিনি বিদ্যালয় থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

১২৯৫ সালে রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল ওহাব সাহেবের কন্যা আয়েশা খাতুনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। আয়েশা খাতুন ছিলেন সর্বগুণসম্পন্না নারী। তাঁর চরিত্র মাধুর্য-গুণে রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেবের দাম্পত্য জীবনে অত্যন্ত সুখ-শান্তি বিরাজ করত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৩০৮ সালে এই পুণ্যশীলা মহিলার মৃত্যু ঘটে। পত্নী বিয়োগের পর রেয়াজুদ্দীন আহমদের সংসারে দারুণ বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত ঘটে। বাধ্য হয়ে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ১৩০৯ সালে মির্জানগর নিবাসী সৈয়দ রহমান বখশের কন্যা হাফেজা খাতুনকে বিবাহ করেন। রেয়াজুদ্দীন সাহেবের দ্বিতীয় পত্নী বিদুষী ছিলেন। তিনি রন্ধন সংক্রান্ত একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। রেয়াজুদ্দীন সাহেবের দুই স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান জন্মলাভ করে নাই। এই দুর্ভাগ্যের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন।

রেয়াজুদ্দীন আহমদের কর্মজীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে। শিক্ষকতা, সাহিত্য-সেবা ও সাংবাদিকতা।

রূপসার পাঠশালায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূত্র-পাত হয়। এই পাঠশালা ক্রমে মধ্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত হয়। পাঠশালার সংলগ্ন একটি পাঠাগারেরও তিনি গোড়াপত্তন করেন। এই পাঠাগারের জন্য মূল্যবান পুস্তক সংগৃহীত হয়েছিল। তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র এবং সাহিত্যপত্র পাঠাগারের কলেবর বৃদ্ধি করত। স্বীয় উদ্যমে তিনি একটি ব্রাঞ্চ পোস্ট-অফিস স্থাপন করেছিলেন। উক্ত পোস্ট অফিসে তিনি পোস্ট মাস্টার নিযুক্ত হন। জীবিকার্জনের জন্য তিনি কাপড় ও মনোহারী দ্রবের দোকান খুলেছিলেন।

www.pathagar.com

'বোধোদয় তত্ত্ব', 'পদ্য প্রসূন', 'তোহফাতুল মোসলেমীন', 'এসলাম তত্ত্ব', 'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ', 'কৃষক বন্ধু', আমার সংসার জীবন', 'জঙ্গে রুম ও ইউনান', 'হক নসিহৎ', 'জোলেখা', 'বৃহৎ হীরকখনি', 'উপদেশ রত্নাবলী', 'জোবেদা খানমের রোজনামচা', 'আমিরজানের ঘরকন্যা', 'বিলাতী মুসলমান', 'হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা', 'হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ),' 'জীবন চরিত', 'পাক পাঞ্জাতন', 'মুসলমান সাহিত্যের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে সবগুলো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ বাল্যকাল হতেই সাহিত্যিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। শিক্ষকতা করার সময়েই তিনি বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখতেন। তিনি দু'খানি পুঁথিও রচনা করেছিলেন। তিনি বিশ্বনবীর জীবনী রচনা করেন। রেয়াজুদ্দীন আহমদের ভাষা-জ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বোধোদয় পুস্তকের ত্রুটি নির্দেশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ ভুল স্বীকার করে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতাপত্র প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতকারের ঘটনা উল্লেখ করে রেয়াজুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, "আমি সালাম করিয়া বসিলাম, তিনি বলিলেন, আমি মনে করেছিলাম, তুমি একজন বয়স্ক পুরুষ। এখন দেখিতেছি তরুণ যুবক মাত্র। তোমার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে।" আমার পরিচয়াদি বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে বলিলেন, "মাঝে মাঝে আসিয়া আমার সাথে দেখা করিও।" এভাবে বিদ্যাসাগর অনেকক্ষণ যাবত তাঁর সাথে বাক্যালাপ করেন। সাধারণত বিদ্যাসাগর বেশীক্ষণ কারও সঙ্গে আলাপ করতেন না।

রেয়াজুদ্দীন আহমদের সাহিত্য-প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তবে নানা কারণে তাঁর সাহিত্য-কর্ম ততদূর প্রসার লাভ করতে পারেনি।

www.pathagar.com

সাহিত্য-প্রতিভা তিনি সাংবাদিকতার কার্যে নিয়োজিত করেছিলেন এবং সফলকামও হয়েছিলেন পূর্ণমাত্রায়। সাংবাদিকতাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

রেয়াজুদ্দীন সাহেব সাংবাদিক হিসেবেই জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বাংলার মুসলমানগণ ছিল অপাংক্তেয়। তাই মুসলমানদের জাতীয় পত্রিকা প্রকাশের প্রবল আকাংখা তাঁর মনে জাগরিত হয়। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি আজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছেন। বস্তুত মৌলবী মুজীবর রহমান ব্যতীত রেয়াজুদ্দীন আহমদের মত সাংবাদিক বাঙালী তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মুসলমানদের মধ্যে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক সৃষ্টির স্বপ্ন নিয়ে তিনি সুখের নীড় ছেড়ে ১২৯০ সালে অপরিচিত কলকাতার পথে পাড়ি জমান। তিনি লিখেছেন, "অবশেষে ১২৯০ সালের ভাদ্র মাসে প্রায় ২০০০ টাকার জিনিসপত্র সম্বলিত দোকানটি কর্মচারীদের হস্তে ফেলিয়া অত বড় হিতৈষী আত্মীয় জমিদার সাহেব এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবর্গের মায়াপাশ-ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান কলকাতা আসিয়া পড়িলাম।"

কলকাতা এসে তিনি চন্দ্রকিশোর বাবুর নিকট হতে নানাভাবে সহায়তা লাভ করেন। ক্রমে পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী, বিদ্যাসাগর, কবি মোজাম্মেল হক প্রমুখের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। কলকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

"কি উদ্দেশ্যে সুদূর মফস্বল ছাড়িয়া কলকাতায় আসিয়াছি, তাহা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার উদ্দেশ্যের বিষয় শুনিয়া বেশ আনন্দলাভ করিলেন। কলিকাতা বড় প্রলোভনময় স্থান, নবাগত লোকের জন্য নানা বিপদের আশংকা, নানা শ্রেণীর জুয়াচোর চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নতুন লোক পাইলেই জালে ফেলতে চেষ্টা করে,

www.pathagar.com

ইত্যাকার বহু উপদেশই আমাকে প্রদান করিলেন।" বিদ্যাসাগরের এরূপ স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের জন্য পণ্ডিত সাহেব গর্ববোধ করতেন। কিছুদিনের মধ্যে সুসাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেনের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হলেন। কলকাতায় অবস্থানরত সকল সাহিত্যিকের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ আরম্ভ করেন। তাঁর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য এ যোগাযোগ অত্যাবশ্যক ছিল। পত্রিকা চালানোর ব্যাপারে তিনি সকলের নিকট আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, অভিজ্ঞতাহীন লোকের পক্ষে পত্রিকা পরিচালনা করা সম্ভবপর নহে। তাই তিনি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা অফিসে কর্মসংস্থান করে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য মনস্থ করেন। তখন সাপ্তাহিক 'ইণ্ডিয়ান ইকো'র সম্পাদক ছিলেন শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়। 'মুসলমান' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশের অভিলাষে তিনি একজন মুসলমান সম্পাদকের জন্য বিজ্ঞাপন দেন। রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'মুসলমান' পত্রিকায় সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাগজখানি তিন মাসের অধিক কাল টিকে থাকতে পারেনি।

'মুসলমান' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি 'শ্রীমন্ত সওদাগর' নামক বাণিজ্য বিষয়ক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-রূপে যোগদান করেন। এই পত্রিকার পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন তাঁর বন্ধু উপেন্দ্র কিশোর। কিন্তু এখানেও বেশীদিন টিকে থাকা তাঁর মত স্বাধীনচেতা লোকের পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি লিখেছেন ঃ

"এখানে আসিয়া দেখিলাম তিনি (উপেন্দ্র কিশোর বাবু) নীলের দালালী এবং কমিশন এজেন্টের কাজ করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন করিতেছেন। আমাকে ঘরভাড়া ও খোরাকি বাবদ ২০।২৫ টাকার বেশী দিতেন না। ক্রমে তাঁহার মেজাজের পরিবর্তন ঘটিল, গতিক ভাল নয় দেখিয়া আমি তাঁহার সংশ্রব ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।" এই সময় কবি-বন্ধু মোজাম্মেল হক তাঁর নিকট আগমন

www.pathagar.com

করতেন। দুই বন্ধুতে সাহিত্য সংবাদপত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা হত।

এই সময় 'ক্রিসেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক মুন্সী আব্দুল মযেজ 'নব সুধাকর' নামক একখানা বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রেয়াজুদ্দীন সাহেব এই পত্রিকার সম্পাদকরূপে গৃহীত হন। কিন্তু ৫।৬ সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তখন তিনি 'ইসলাম' নামক একটি মাসিক পত্রিকার সংগে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। উক্ত পত্রিকাখানিও অত্যল্পকালের মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাংবাদিকতার চাকুরীতে বারবার ব্যর্থ হয়েও তিনি এক্ষেত্রে যে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তা বৃথা যায়নি। তদুপরি তিনি আসল উদ্দেশ্যের কথা কখনও ভুলেন নি। নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি মনে মনে প্রস্তুতি নিতে থাকেন এবং এ প্রস্তুতির কার্যে সাংবাদিকতার চাকুরীতে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়।

মুন্সী রেয়াজুদ্দীন স্বজাতির দুর্দশায় মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করতেন। এ সময় মুসলমানদের জীবনে এক দুর্দশা নেমে আসে। অনেক মুসলমান পাদ্রীদের প্রচারের ফলে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন। সমাজের এই অবনতি তাকে অস্থির করে তুলে। তিনি রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী, মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ প্রমুখের সঙ্গে পরামর্শ করতে থাকেন। এ পরিস্থিতিতে কি করা যায়! তিনি লিখেছেন, "ইহাও শুনিলাম, রংপুর জেলার কোন কোন গ্রামবাসী কতকগুলো মুসলমান করতাল সহযোগে হরি সংকীর্তন করে, নিরামিষ, হিন্দুর মত পিড়িতে বসিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে আহার করে। তাহাদের মধ্যে মুসলমানের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না।"

এই দুর্দিনে তাঁর মত সমাজদরদী নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না। তিনি এবং আরও কয়েকজন আদর্শবান ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ইসলামের মর্মবাণী সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার

www.pathagar.com

করতে হবে। আরবী-ফারসী ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ ইসলামী গ্রন্থগুলো জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের মহান আদর্শের প্রতিচ্ছবি তুলিয়া ধরে। ফলে মুসলমানগণ সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পায়। রেয়াজুদ্দীন সাহেব দেখলেন মুসলমানদের মধ্যে প্রচার ও আন্দোলন জোরদার করতে হলে সংবাদপত্র অত্যাবশ্যক। কেননা সংবাদপত্র জনমত গঠন ও আদর্শ প্রচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। অবশেষে তাঁর চরম প্রচেষ্টার অমৃত ফল 'সুধাকর' ১২৯৬ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। এতদিনে রেয়াজুদ্দীন সাহেবের স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করে। এই পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে অহর্নিশ কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। পত্রিকার কার্য ৯০ নং ওল্ড বৈঠকখানা রোডে অবস্থিত ছিল। পত্রিকাখানি কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হলেও রেয়াজুদ্দীন সাহেবই ছিলেন সর্বেসর্বা। প্রুফ দেখা থেকে আরম্ভ করে চিঠিপত্র আদান-প্রদান, বিজ্ঞাপনের হিসাব ইত্যাদি সকল ব্যাপারই তাঁকে সমাধা করতে হত। বস্তুত পত্রিকাকে দাঁড় করানোর জন্যে তিনি আহার নিদ্রার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "এজেন্টদিগের নিকট চিঠিপত্র লেখা বিস্তৃত চিঠিতে তাহাদের উপদেশ প্রদান করা উৎসাহী ও হিতৈষী বন্ধু-বান্ধব এবং গ্রাহকদিগকে চিঠি-পত্র লেখা, কাগজের প্রবন্ধ ও প্যারা ইত্যাদি লেখা, বিজ্ঞাপনের হিসাবপত্র রাখা, কম্পোজিটারদের কাজকর্ম দেখা, অধিকাংশ গেলি প্রুফ দেখা ইত্যাদি সমস্ত কার্যই আমাকে করতে হইত।"

'সুধাকর' পত্রিকার আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। পরিচালনার ক্ষেত্রে মাঝে মঝে অচালবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রচুর বাধা বিপত্তি ও ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করেও তিনি পত্রিকার কাজ চালিয়ে যেতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে পত্রিকা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। বাধ্য হয়ে ছ মাস পর ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে আইনজীবী সিরাজুল ইসলামের নিকট তিনি পত্রিকার স্বত্ব বিক্রয় করেন এবং নিজে বেতনভোগী

www.pathagar.com

সম্পাদকরূপে কর্মরত থাকেন। পরে একটি মামলায় জড়িত হওয়ায় পত্রিকার সঙ্গে তাঁকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়। এই মোকদ্দমায় তিনি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েন। 'সুধাকর' পত্রিকা পরিচালনা করার সময় তিনি 'ইসলাম প্রচারক' নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পরে তিনিই পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী হয়ে সুচারুরূপে পরিচালনা করেন। পত্রিকাটিকে তিনি সাহিত্য পত্রিকায় রূপদান করেন এবং একে কেন্দ্র করে একটি মুসলিম সাহিত্যিক চক্র গড়ে ওঠে।

এই সময়ে তিনি 'বৃহৎ মহাম্মদীয়' পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। এ পঞ্জিকা ২৩ বছর পর্যন্ত চালু রেখেছিলেন।

শেখ আবদুর রহীম সম্পাদিত 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার জনপ্রিয়তা দেখে এক দল সাহিত্যিক 'গোষ্ঠী' নামক অপর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। রেয়াজুদ্দীন উক্ত পত্রিকার সম্পাদকরূপে গৃহীত হন। ১৩১২ সালে চৌধুরী আবদুল মজিদ ও মৌলভী মির্জা মোহম্মদ ইউসুফউল্লাহ্‌র অর্থানুকূল্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৫ সালে তিনি 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করেন। অচিরেই পত্রিকা দুটি বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর রেয়াজুদ্দীন সাহেব 'মোসলেম হিতৈষী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে কর্মরত থাকেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, "যখন মৌলানা শাহ সূফী মোহাম্মদ আবুবকর পীর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মৌলভী আবদুর রহমান ছাহেবের তত্ত্বাবধানে ও মুন্সী শেখ আবদুর রহীম ছাহেবের সম্পাদকতায় 'মোসলেম হিতৈষী' বাহির হয়, তার কিয়ৎকাল পরে আমি উহার এডিশনাল সম্পাদক নিযুক্ত হই। পরে কাগজের আপিস গৃহাদী অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইলে উহা কিছুকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়।"

www.pathagar.com

'মোসলেম হিতৈষী' আপিস দগ্ধীভূত হওয়ার পর তিনি ভীষণ অর্থ-কষ্টে পতিত হন। বাধ্য হয়ে তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন। দু' বছর পর তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই অনুপস্থিতিতে বন্ধুরূপী বিশ্বাসঘাতক তাঁর গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করে। এতে তিনি আরও বিপন্ন হয়ে পড়েন। এই দুরবস্থার কথা জানতে পেরে শেরে বাংলা ফজলুল হক স্ব-পরিচালিত 'নবযুগ' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব রেয়াজুদ্দীন আহমদের হাতে অর্পণ করেন কিন্তু 'নবযুগ' অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তিনি বেকার হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের ভাষায় :

"এই সময় আমি বেকার ও সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া পড়িলাম, কিন্তু একটি বৃহৎ ছাপাখানার কার্যভার পাইয়া শান্তির নিশ্বাস ফেলিতে সক্ষম হইলাম।"

তিনি যে প্রেসে নিযুক্ত হলেন তার স্বত্বাধিকারী ছিলেন মেসার্স মনিরুদ্দীন আহমদ এণ্ড সন্স কোঃ। রেয়াজুদ্দীন প্রেসে কর্মরত অবস্থায় 'মোসলেম বাণী' নামক একখানি সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদকরূপেও কাজ করতেন।

অতঃপর তিনি 'রেয়াজুল ইসলাম প্রেস' নামক একটি প্রেস স্থাপন করেন। উক্ত প্রেস থেকে নিজেই কিছু বই প্রকাশ করেন। মুসলমান লেখকদের বই ছেপে তিনি তাদের উৎসাহিত করেন। মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর অনূদিত 'কিমিয়ায়ে সাদাত' এই প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।

প্রেসখানি তাঁর জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু নানা বিপদ একটির পর একটি তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে। দেশের সম্পত্তি নিয়ে তিনি মামলায় জড়িয়ে পড়েন। তাছাড়া আপত্তিকর পুস্তক ছাপানোর অপরাধে সরকার তাঁকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করে। বিপদ একা আসে না। এই সময় তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে।

www.pathagar.com

নিরুপায় হয়ে এক ব্যক্তির হাতে প্রেসের ভার অর্পণ করে তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর কলকাতা প্রত্যাবর্তন করে দেখেন আমানতকারী ব্যক্তিটি তাঁর সবকিছু আত্মসাৎ করে নিজের উদর বৃদ্ধি করেছে। তিনি দারুণ দুর্দশায় নিপতিত হন। সমাজের মঙ্গলকামী মানুষকে যাঁরা ভালবাসেন এবং যাঁরা মানুষকে বিশ্বাস করেন তাঁদের ভাগ্যে বোধ হয় এই পরিণাম ঘটে।

দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে তাঁর কর্মতৎপরতা কখনো ক্ষান্ত হয়নি। ঢাকায় মুসলমান 'সুহৃদ সম্মিলনী' নামে যে প্রতিষ্ঠান ছিল তাতে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এই সম্মিলনীর কাজে তাঁকে অনেক সময় ঢাকা-কলকাতা পাড়ি জমাতে হয়েছে। নবাব নবাব আলী এবং শেখ আবদুর রহীম উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান পরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' নামে রূপান্তর লাভ করে। এর মাধ্যমেই তরুণ মুসলমান সাহিত্যিক চক্রের সৃষ্টি হয়। মুসলমান-সাহিত্য ও সাহিত্যিক সৃষ্টির ব্যাপারে উক্ত সমিতির দান অপরিসীম।

জীবনের সকল পরিস্থিতেই রেয়াজুদ্দীন সাহেব নিজেকে সমাজের কাজে নিয়োজিত রাখেন। ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। অবশেষে ১৩৪০ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মুন্সী রেয়াজুদ্দীন সাহেব এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সর্বদা ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে সমাজের স্বার্থকে স্থান দিতেন। সমাজের কল্যাণে শারীরিক কিংবা আর্থিক কোন বাধাকেই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব বলেছিলেন :

"জনাব মুনসী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব আজ জরা-জীর্ণ দেহ লইয়া সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ায় আমরা নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আমাদের প্রথম যশস্বী সাংবাদিক এবং

www.pathagar.com

সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকরূপে সমিতির পক্ষ হইতে আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই।"

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মভীরু। জাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ও বৈশিষ্ট্যকে তিনি মনেপ্রাণে ভালবাসতেন। এমদাদ আলী বলেছেন, "মুসলমান সাহিত্যসেবীদের রচনা সংস্কার করিয়া দেওয়ার কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া তিনি আত্মগৌরব লাভে প্রয়াসী ছিলেন না। গোপন কথা গোপনই রাখিতেন। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।" মহানবীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁর বন্ধুপ্রীতি ছিল অসাধারণ। তৎকালীন মুসলিম বাংলার প্রায় সকল সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ও সমাজসেবীদের সহিত তাঁর সম্পর্ক ছিল অতীব মধুর। সৈয়দ এমদাদ আলী, নবাব নবাব আলী, শেখ আবদুর রহীম, মীর মোশাররফ হোসেন, মুন্সী মেহেরউল্লাহ্, কবি মোজাম্মেল হক, রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, শেরে বাংলা ফজলুল হক, মীর্জা ইউসুফ আলী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অতি মধুর।

মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে উজ্জীবিত করার সাধনা করেছেন। তাঁর এ সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। তাঁর হস্তে গঠিত বাকি পথ ধরেই বাংলার মুসলমান আজ রাজপথের সন্ধান লাভ করেছে। তিনি অবহেলিত মুসলিম সমাজে সাংবাদিকতার যে মাটির প্রদীপ জ্বেলেছিলেন, তা আজ সূর্যের আলোয় ভাস্বর। তাই মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র, প্রেরণার উৎস।

www.pathagar.com

কবি দাদ আলী

কবি দাদ আলী ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত আটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ নাদ আলী মিঞা। মাতা সৈয়দা মাজেদোন্নেছা।

মাত্র তিন বছর বয়সে তাঁর পিতা ইহকাল ত্যাগ করেন। তিনি গৃহশিক্ষকের নিকট আরবী ও ফারসী ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। এগার বছর বয়সে বিদ্যাশিক্ষার মানসে তিনি মুর্শিদাবাদ গমন করেন। তথায় তিনি পীর শাহ্ আব্দুল হকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। পীরের নিকট ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ না হলেও কবি স্বীয় অধ্যবসায়বলে নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাঁর জ্ঞান-স্পৃহা ছিল অতীব প্রবল। কবি পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষায় অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি এতদূর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যে, উক্ত ভাষার প্রায় সমস্ত বিখ্যাত গ্রন্থ তিনি পাঠ করে তার মর্মোদ্ধারে সক্ষম হন। কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটক-কাব্যখানি তাঁর অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল।

বাংলা ভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ ছিল। বাংলা ভাষায় তিনি বিস্তর পড়াশুনা করেছেন। বাংলা অভিধানের এক বিরাট অংশ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

দাদ আলী মূলত কবি হলেও কাব্য-চর্চার মধ্যেই তাঁর কর্ম-জীবন সীমাবদ্ধ ছিল না। জনসেবার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কম নয়। সর্বদা তিনি জনগণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। নিজ গ্রামে তিনি একটি স্কুল স্থাপন করে দরিদ্র গ্রামবাসীদের বিদ্যার্জনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

পুষ্করিণী খনন করেন। মসজিদ নির্মাণ ও অন্যান্য জনসেবার জন্য তিনি তদঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

১২৭৫ সালে কবি যশোর জেলার কাজী পরিবারের এক অপূর্ব রূপলাবন্যময়ী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর পত্নীর নাম সাকিউন্নেসা। কবির দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত মধুর। স্ত্রীকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসতেন। ১৩১০ সালে এই সতী সাধ্বী মহিলা ইহধাম ত্যাগ করেন। তখন কবির বয়স একান্ন বছর।

দাদ আলী ছিলেন একজন স্বভাব-কবি। বাল্যকালে তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা কিংবা অন্যের কবিতার অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করে দিতে পারতেন। স্বভাব-কবি হলেও জীবনের মধ্য বয়সেই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এগার বছর বয়সে স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ 'ভাঙা বুক' স্ত্রী-বিয়োগের পরবর্তী সময়ে লিখিত। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আরও ৩৩ বছর কাল জীবিত ছিলেন। তাঁর সাহিত্য কর্ম এই তেত্রিশ বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কবি দাদ আলী যখন কাব্য রচনা করেন, তখন মুসলমান কবি সাহিত্যিকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। মুসলমান সমাজের এই হীনাবস্থা দর্শন করে কবি খুব ব্যথিত হন। তাঁর কাব্য রচনা মুসলমানদের সাহিত্য সেবায় প্রভূত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কবির গ্রন্থ-সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব ২ খানি, সৈয়দ আলী আহসান ২ খানি, কবি আশরাফ সিদ্দিকী ১৩ খানি এবং ডঃ গোলাম সাকলায়েন ১৮ খানি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

কবির যে যে পুস্তকগুলোর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো পর-পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা গেল।

www.pathagar.com

'ভাঙা প্রাণ' ১ম ও ২য় খণ্ড, 'আশেকে রসূল' ১ম ও ২য় খণ্ড, 'শান্তিকুঞ্জ,' 'সমাজ শিক্ষা', 'ফারায়েজ', 'জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু' এবং 'আখের মউত'।

'ভাঙা প্রাণ' ১ম খণ্ড ১৩১২ বাংলা সালে প্রকাশিত হয়। কাব্যটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভাঙা প্রাণ' কাব্যে পেয়ে হারানোর অসহ্য বেদনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' এ ধরনের কাব্য। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদভ্রান্ত প্রেম' এবং কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের 'ভাঙা বুক' উপন্যাসে এ ধরনের বিরহ-ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। 'ভাঙা প্রাণ' বিরহদীর্ণ কবির অনুরাগ রসে রঞ্জিত একখানা করুণ মধুর কাব্য। প্রেমময়ী পত্নী বিয়োগের দীর্ঘশ্বাস কাব্যের প্রতি ছন্দে ফুটে উঠেছে। 'ভাঙা প্রাণ' প্রথম খণ্ডে ১৭টি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। কবিতাগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ঈশ্বর, মোহাম্মদ (সঃ) নীতি, মৃত্যুকালীন বিলাপ, এক শূন্যে সব শূন্য, কি যেন আমার নাই, আর কি দেখিব, রেখ অভাগারে মনে, নিসর্গ তস্কর, মৌনবতী, বিবাহ সজ্জা, রাখ মোর প্রাণ, আমিই কাঁদিব, হাহাকার, দুঃখই সুখের মূল, আজি পোহাল, অপ্রেমিক ও মদন। প্রত্যেকটি কবিতাই যেন এক একটি অশ্রুবিন্দু। প্রিয়াকে হারিয়ে সমগ্র বিশ্ব তাঁর কাছে শুন্য মনে হচ্ছে, কোথাও তিনি সান্ত্বনার রেশ খুঁজে পাচ্ছেন না :

কি যেন আমার নাই, খুঁজি আমি তাই রে
খুঁজিলে এ ত্রিভুবনে কোথাও না পাই রে।
সুধাইব কারে আর
হেন বন্ধু কে আমার
কে লবে এমন করে, কার কাছে যাই রে
কি যেন আমার নাই, খুঁজি আমি তাই রে

www.pathagar.com

দাসের বিপদ নাথ, কর না হরণ রে।
যাতে হৃদে শান্তি পাই
শান্তিদাতা কর তাই
প্রিয়ার বিরহ আর সহিতে নারিব রে,
এ চোখে ও চাঁদ মুখ আর কি দেখিব রে।

মৃত্যুকালীন বিলাপ কবিতার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

(১)

হায় হায় কি হইল ! বিনা মেঘে কে করিল
অকস্মাৎ বজ্রপাত শিরে,
কার সাথে ছিল বাদ—কে সাধিল এ বিবাদ
ডুবাইল চির দুঃখিনীরে।

(২)

এইমাত্র আলাপিলে এমনি নিস্তব্ধ হলে
চাঁদমুখে কথা নাই কেন
একবার চক্ষু মেলি একবার মুখ তুলি
কান পাতি দুটি কথা শুন।

(৩)

যাবে তুমি কি লাগিয়া বল প্রিয়ে বিশেষিয়া
আমিও যাইব তব সাথে
কখনো যাওনি একা, পথে কত বিভীষিকা
আছে প্রিয়ে পাইবে দেখিতে।·· ইত্যাদি

'একে শূন্য সব শূন্য' কবিতায় কবির মনোভাবের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল :

বিগত যামিনী যোগে দেখেছি যে সুস্বপন
জনমে কভু আর হবে তাহা সংঘটন

www.pathagar.com

কহিব কাহার কাছে
তুমি ছাড়া কে বা আছে
এ পোড়া মনের কথা বুঝে কোন্ জন?
প্রেমিক না হলে প্রেমের কে করে যতন!
শূন্য করি গৃহদ্বার শূন্য করি মম হৃদি
শূন্য করি দশ দিশি অটবী অচলাম্বুধি
গেলে প্রিয়ে! শূন্য দেখি
যে দিকে ফিরাই আঁখি
এক শূন্যে শত শূন্য, শূন্য বই নয়
বামে যার এক নাই শুন্য নিশ্চয়।

কবি অহনিশি ক্রন্দন করেছেন। কিন্তু এ ব্যথার জ্বালা কাউকে স্পর্শ করতে দেবেন না। 'আপনার মনে পুড়িয়া মরিব গন্ধ বিধুর ধুপ' এই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন 'আমিই কাঁদিব' কবিতায়:

আমার দুঃখের কথা কহিব কাহারে রে
শুনিবে যে জন
তার হৃদি যাবে গলে
ভাসাইবে অশ্রুজলে
তার সে উরস স্থল সদা সর্বক্ষণ
তাই বলি এ যাতনা
আর কারেও কহিব না
অন্যেরে কাঁদাব না আর, আমিই কাঁদিব।

কবি এ কাব্যখানি দীক্ষাগুরু শাহ আবিদুল হক সাহেবের নামে উৎসর্গ করেন। নিম্নলিখিত ছন্দে তিনি উৎসর্গপত্র রচনা করেছেন:

নমে তব পদে দাস তোমা ভিন্ন মনো আশ
আর কে মিটাবে, দেব! নাই হেন স্থান

www.pathagar.com

কৈশোরেতে পিতৃহীন, সঙ্গ দোষে অর্বাচীন
দেখি তাই, ও হৃদয় করুণানিধান
পিতৃব্য হৃদে দয়া আরো উপছিল মায়া
কুরঙ্গ হইতে তাই ফিরাইলে দাসে।
সাধু হৃদি স্বর্ণ সম, এ জগতে অনুপম,
চালুনীর সম কভু ও হৃদয় নয়।
যাঁর প্রেমে শিখাইলে, যাঁর প্রেমে বিলাইলে
এ হৃদয় ব্যগ্র তার রউজা দরশে
সে প্রেমে মরম রুগ্ন মানেনাক বাধা বিঘ্ন
সিন্ধুপারে যাই, দাও বিদায় হরষে।

কবির 'ভাঙা প্রাণ' কাব্যখানি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ কাব্যের আলোচনা প্রসংগে বলেছেন :

"গ্রন্থখানির ভাষা যদিও স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কঠিন কিন্তু তাহা অত্যন্ত সুমধুর এবং গভীর ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। এই কাব্য সাহিত্য সমাজে সম্পূর্ণরূপে সমাদৃত হইবার যোগ্য।"

'ভাঙা প্রাণ' ১ম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার দুই বছর পরে এর ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। তবে ২য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ১ম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার আগেই প্রস্তুত করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন :

"দ্বিতীয় খণ্ড 'ভাঙা প্রাণ'-এর পাণ্ডুলিপি লেখকের নিকট প্রস্তুত। প্রথম খণ্ড 'ভাঙা প্রাণ' সাধারণের স্নেহ-চক্ষে পড়িলেই দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত হইবে। যদিও লেখক বয়সে প্রবীণ কিন্তু লেখক শ্রেণীতে নতুন বলিয়া পরিচিত। খুঁজিলে পুস্তকে শত শত দোষ দৃষ্ট হইবে, যাহার চক্ষে যে দোষটি লক্ষিত হইবে, সেইগুলি গ্রন্থকারের নিকট লিখিয়া পাঠাইলে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইবে।"

www.pathagar.com

'ভাঙা প্রাণ' কাব্যখানিই কবির প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

কবির 'আশেকে রসূল' কাব্যখানির প্রথম খণ্ড ১৩১৪ বাংলা সালে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশক ছিলেন মুহম্মদ ইউসুফ আলী ও মুহম্মদ মনসুর আলী। পুস্তকটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪৮। কবি বৃদ্ধ বয়সে মক্কাশরীফে হজ করতে যান। সাধ ছিল মদিনা শরীফে বিশ্ব-নবীর মাযার দর্শন ও যিয়ারত করবেন। শারীরিক অসুস্থতাবশত তাঁর আশা পুর্ণ হয়নি। এই বিফলতার ক্ষেদোক্তি 'আশেকে রসূল' কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ। এই কাব্যটিও সাধারণের সমাদর লাভ করেছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি। নতুন কিছু কবিতা উহাতে সংযোজিত হয়। 'আশেকে রসূল' কয়েকজন দানশীল ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি সর্বস্তরে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। অধ্যক্ষ মুহম্মদ ওহিদ সাহেব বলেন :

"মৌলবী মোহাম্মদ দাদ আলী প্রণীত ১ম ও ২য় খণ্ড 'আশেকে রসূল' কিয়দাংশ পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম এবং তাঁহার পুত্র ইউসুফ আলী সাহেবের মুখে উক্ত পুস্তকের আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসাধ্য। কবিতাগুলোর ভাষা অতি উচ্চ ও পবিত্র। কবি মোহাম্মদ দাদ আলী সাহেব লেখকদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার কবিতাগুলো গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ, যাহারা নাটক নভেলে অনুরক্ত আমি তাহাদিগকে একবার মনোযোগের সহিত 'আশেকে রসূল' গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

'আপনার প্রদত্ত 'আশেকে রসূল' নামক কাব্যগ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

www.pathagar.com

পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। কবিতাগুলির ভাব পবিত্র ও হৃদয়গ্রাহী এবং ভাষা সরল ও সুমধুর।"

মৌলবী মোহাম্মদ সোলায়মান সাহেব লিখেছেন, "আমি আশা করি, বঙ্গের হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সহজেই ইহা পাঠে আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। কবিতাগুলি গভীর ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে এবং গ্রন্থখানি কেবল আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়াই লিখিত। মুসলমান নর-নারীর পক্ষে ইহা ওজিফা বলিলেই ঠিক হয়।"

'আশেকে রসূল' ১ম খণ্ডে ৩৬ টি কবিতা আছে। কবিতাগুলোর নাম নিম্নে দেয়া গেল :

'প্রার্থনা', 'মুনাজাত', 'রবিউল আউয়াল', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'মোহাম্মদ রসূলুল্লা', 'সাল্লে আলা', 'কাবা হইতে বিদায়', 'মদিনা বিরহ', 'পিউকাহা', 'সবি মিছে', 'হাবীবে খোদা', 'হে হাবীব', 'পয়গাম্বর', 'হে রসূল দেখ আঁখি তুলে', 'না ছাড়িব কদাচ কেন পাগলামী কেন', 'হেমেযার মতি', 'শাফিয়ে মাহশার', 'ত্রিদশ দিবস', চিনতে নারিলী', 'কিছু চাহিনী', 'হুলিয়ানামা', 'শাফিউল মজনেবিন', 'পাপীর পরম বন্ধু', 'হরিণীর মুক্তি', 'হেলায় হারাইলে', 'হৃদয়ের ধন', 'সুখের সাগরে', 'গজল বেহাগ', 'গজল রাগতানা', 'গজল হিন্দীর স্বরে', 'গজল শ্যাম কল্যাণ' 'গজল আলেয়া', 'গজল ফিকির চাঁদের স্বরে' ও 'মদিনা বীণা'।

উক্ত কাব্যখানি শাহ মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের নামে উৎসর্গ-কৃত হয়। উৎসর্গপত্রের কিয়দংশ নিম্নে দেয়া হল :

বহু গুণে গুণধর গুরুদেব বংশধর
সযতনে মেলি কর লও উপহার
তোমারে দিতেছি দীন, যদিও মূল্যবিহীন
অন্যজনে কি বুঝিবে মরম ইহার ··।

www.pathagar.com

'আশেকে রসূল'-এ সন্নিবেশিত কবিতার কিছু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল :

(ক) তোমার আশীষ লয়ে যাইব রে মদিনায়
এ সাধ আছিল হৃদে সাধিল কে বাদ তায়।
(কাবা হইতে বিদায়)

(খ) এ পোড়া নয়নে তোমার পরশ
পবিত্র দেহটি হল না পরশ
জ্বলিছে হৃদয়ে হিরণ্য বেতস
তোমার বিরহে কহিব কিরে
হজ্জ প্রার্থী আমি এ মক্কায়
যে গুড়ে পড়েছে বালিকণা রে
পীড়া রূপ রিপু পিড়িল মোরে।
(মদিনা বিরহ)

(গ) উম্মত উম্মত করি
সর্বদাই ক্রন্দন
হতে হল পুনঃ
প্রত্যাদেশ বচন।
এই রূপে কঠোর তপ
নাহিক প্রয়োজন
যা তব শরীরে সহে
কর তাই সাধন
সন্তুষ্ট তোমার পরে
হয়েছি তব স্তরে
উম্মতের তরে তুমি
যা চাবে তাই পাবে।
(পাপীর পরম বন্ধু)

www.pathagar.com

'আশেকে রসূল' ২য় খণ্ডে ১৩টি কবিতা স্থান পেয়েছে। 'মুনাজাত', 'হাবীবে আল্লা', 'ওম্মতের প্রতি দয়া', 'দয়ার সিন্ধু', 'নবী উম্মতের গৌরব', 'শিশুর পুনর্জীবন', 'সদুপায় কর', 'মেয়ারাজ', 'রসুলুল্লাহ্‌র আগমন', 'প্রতীচি সমীরণ', 'ধৈর্যে সফলতা', 'কোথা যাবি বল', 'অন্তিমে যেন মরণ'।

'আশেকে রসূল' দুই খণ্ডই সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বস্তুত 'ভাঙা প্রাণ' এবং 'আশেকে রসূল'ই কবিকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'শান্তিকুঞ্জ' কাব্যখানি ১৩২৪ বাংলা সালে আত্মপ্রকাশ করে। পুস্তকখানি ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থ সাহায্যে মুদ্রিত হয়। উক্ত কাব্যের মর্মবাণী সম্পর্কে কবি লিখে গেছেন, "জগৎ সৃষ্টি হইতে এ পর্যন্ত চিরদিনই বিশুদ্ধ প্রেমের আদর হইয়া আসিতেছে এবং প্রলয়কাল পর্যন্তও উহার আদর সমভাবে থাকিবেই বরং লোকান্তর জগতে প্রেমের গৌরব আরও ঊর্ধ্বে। সেই বিশুদ্ধ প্রেমরূপ শান্তরস অবলম্বনে এই শান্তিকুঞ্জ'-খানি লিখিত।" কবি এ কাব্যখানি প্রকাশের জন্য বর্ধমানের রাজা বিজয় চাঁদ মাহতাপের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে যে কবিতাখানি লিখেন, নিম্নে তার কিয়দংশ প্রদত্ত হল :

হে মহান ও হৃদয় কেবলি করুণাময়
বিরূপাক্ষ কিবা শৌরী, কিবা দশানন অরি
জল মম তুমি শুচি, হিতার্থী দধিচি
দানে কল্প মহীরুহ তুমি এ ভারতে
দণ্ড দিতে দুষ্টে, জন্ম শিষ্টেরে পালিতে
আছে কি পরোপকারী তোমার সম কেহ।

* * *

হর্ষে কর দান 'শান্তিকুঞ্জ' মুদ্রাঙ্কিতে
অচিরে মুদ্রণ কার্য পারিব সাধিতে।

www.pathagar.com

নগণ্য লেখকদের ক্ষুদ্র উপহার
সকৌতুকে মহারাজা হের একবার।

মহারাজা তাকে দয়াপরবশ হয়ে একশত টাকা প্রদান করেন। 'শান্তিকুঞ্জ'-এ মোট ২২খানি কবিতা নেয়া হয়েছে। যেমন—'প্রার্থনা', 'অনুতাপ', 'কোকিল', 'প্রতিদান চাহি না', 'আমি সতী', 'মেঘ', 'কাতর পরাণে ডাক', 'নিদ্রা', 'অনিল', 'কঠিন', 'নৈশচক্রবাক', 'বিচ্ছেদ', 'ধৈর্যশীল জনই সুখী', 'পাষাণে রেখা', 'সৎসংগে কুকুর ও সাধু', 'স্বপ্নে বউ কথা কও', 'চোখ গেল', 'সুধাংশু', 'অদৃষ্টলিপি' ও 'বিদায়'।

নিম্নে 'শান্তিকুঞ্জ'-এ কতিপয় কবিতার নমুনা প্রদত্ত হল :

(ক) দাতার অগ্রণী বলি, বংগে যিনি যশোবাণ
তাহার দয়ায় 'শান্তিকুঞ্জ' পেল অর্ধপ্রাণ
নাম তার ব্যোমকেশ
সাধনায় ব্যোমকেশ
আশ্রয়হীনের একই আশ্রয়স্থল
করিবেন পরমেশ তার সুমঙ্গল।

(অদৃষ্টলিপি)

(খ) হে অনাথ বন্ধো! তুমি অনাথের বন্ধু হও
করুণা কটাক্ষে নাথ, এ অনাথ পানে চাও
মহানিদ্রা দাও চোখে
ভুলে যেয়ে শোকে দুঃখে
নেহারিতে সদা, দূর করিও
পলকবিহীনে, তোরে হেরিব প্রাণেশ।

(নিদ্রা)

(১)

চল সাথে চল না রে মদিনা
হেরিবারে নবীবরে চল না

www.pathagar.com

(২)

কার আশে ঘরে বসে রহিলে
মিছে কাজে পরমায়ু হারালে।
(সৎসংগে কুকুর ও সাধু)
প্রাণাধিক ভালবাসা আমার নয়নতারা
ইদি, মনু এহমান, মেহেরুন ও জোহরা
ইউছুফ ও চেহারা
আয় সবে আয় তোরা
চুমি বেদনার বিন্দু আয় তোরা আয়
সহৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।
(বিদায়)

'শান্তিকুঞ্জ'-ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কাব্যটির কয়েকটি কবিতা জনগণের মুখে মুখে শোনা যেত।

কবির অন্যতম কাব্য 'সমাজ শিক্ষা' ১৩২৬ সালে প্রকাশিত হয়। পুস্তকটিতে ১৯টি কবিতা স্থান পেয়েছে। পুস্তকখানি সমাজসেবী নবাব নবাব আলী চৌধুরীর নামে উৎসর্গ করা হয়। উদ্দীপনা ও সামাজিক উন্নতিমূলক উপদেশে এ কাব্য ভরপুর।

"বর্তমান পতিত মুসলমান সমাজের দুরবস্থাগুলো সমাজ হিতৈষী মহাত্মাগণের হৃদয়ংগম করাইবার জন্যই গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।" মুসলিম সমাজের অধঃপতন দর্শনে বেদনাপ্লুত মনে তিনি লিখেছেন :

পূর্বের গৌরব স্মরণে কি ফল
স্মৃতি হলে হৃদে জ্বলে তুষানল
মিছে উদ্বোধনে কিবা লাভ বল
গিয়াছে চলিয়া কত সুনামী।

কবির এ কাব্যখানি তাঁর সমাজ কল্যাণকামী মনের উজ্জল প্রতিচ্ছবি।

তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ হল : 'ফারায়েজ,' 'জ্ঞাতিশত্রু বড় শত্রু' এবং 'আখের মউত'। গ্রন্থত্রয় কবি-পুত্রদের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

এসব গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। এতদ্ব্যতীত কবি রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলোর নাম জানা যায়।

১। দেওয়ানে দাদ ২। ভাঙা প্রাণ (৩ খণ্ড)
৩। মসলা শিক্ষা ৪। সংগীত প্রসূত
৫। উপদেশমালা ৬। এলোপ্যাথিক জ্বর চিকিৎসা
৭। আয়ুর্বেদ রত্ন ৮। কানা চোখের অঞ্জন।

কবির ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত মধুর ও অনাড়ম্বর। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু পুরুষ ছিলেন। ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজের উন্নতি বিধান কল্পে তিনি মনপ্রাণ ও লেখনী নিয়োজিত করেন। ইসলামের সেবকরূপে মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ ও শেখ জমিরউদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সংগে মিলিত হয়ে তিনি দেশের প্রান্তে প্রান্তে ধর্মের আদর্শ প্রচার করে বেড়িয়েছেন। অধঃপতিত সমাজের উন্নতিই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

কবির প্রথম জীবন ছিল সুখময়। কিন্তু প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর মনের সান্ত্বনা ও আনন্দ চিরতরে বিদূরিত হয়ে যায়। এ সময় তিনি নিঃসংগ মনে জীবনমৃত অবস্থায় কাল যাপন করতেন। লোকজনের সংশ্রব এড়িয়ে চলতেন। মসজিদ ও পুষ্করিণী সংলগ্ন স্থানে একখানি ঘর বেঁধে তথায় তিনি বসবাস করতেন। ঘরখানির নামকরণ করেছিলেন 'হাওয়াখানা'। তাঁর অধিকাংশ কাব্যই এই 'হাওয়াখানা'য় রচিত। তিনি প্রায় সময় স্বরচিত কবিতা 'কি যেন আমার নাই' আবৃত্তি করে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতেন। অনেকে এ কান্নাকে আল্লাহ্র বিরহ বেদনার বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন।

অবশেষে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে (১৩৪৩ সালের ৫ই পৌষ) ৮৪ বছর বয়সে কবি দাদ আলী ধরণীর মায়া ত্যাগ করেন। প্রিয় 'হাওয়াখানা'র পার্শ্বেই কবির শেষ শয্যা রচনা করা হয়। সর্বমোট তাঁর এগারজন সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করে।

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়া

চতুর্দিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোথাও একটু আলোর আভাস নেই। যেন বর্ষার অমানিশা। কিন্তু রাতের অন্ধকার এটা নয়, গুহার অন্ধকারও নয়। এ অন্ধকার বাংলার মুসলিম নারী জাতির। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত সে নিশ্চল, পঙ্গু, নিরানন্দ। দুঃসহ এ গ্লানিময় জীবন। একদিকে অশিক্ষা, অন্যদিকে অবরোধের বিভীষিকা। সংখ্যায় সমাজের অর্ধেক তারা, পরিবেশের নিপীড়নে তারা পরিণত হয়ে পড়ে জড় পদার্থে। জীবনকে কল্যাণময় ও সুন্দর করে তুলবার দায়িত্ব যাদের হাতে, পুরুষরা তাদের পোষা জন্তুতে পরিণত করেছে। আকাশের মুক্ত বিহংগীকে শুধু খাঁচায় বন্দী করা হল না, সেই সংগে কেটে দেয়া হল তার পাখা দুটো। বিশ্বনবী বলেছেন, "আমি পৃথিবীকে ভালবাসি. কেননা এ বিশ্বে সুগন্ধি এবং নারী রয়েছে।" বাংলার মুসলমান সেই নবীর উম্মত হয়ে নারী জাতিকে বন্দী করল অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের লৌহ নিগড়ে। কিন্তু একদিন অন্ধকারের কাফন ভেদ করে আলোর শিখা জ্বলে উঠল। অবহেলিত নারী সমাজে আলোর দীপালী যাঁর কল্যাণ হস্তে প্রদীপ্ত হল, তাঁর নাম বেগম রোকেয়া।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জহিরউদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাবির।

রোকেয়ার পরিবার ছিল অত্যন্ত পর্দানশীন। অতি অল্প বয়সে রোকেয়াকেও পর্দা করতে হত। বাড়ীর মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার তেমন সুযোগ ছিল না। বাঙালীর মেয়ে হয়ে বাংলায় লেখাপড়ায় চর্চা ছিল রীতিমত অপরাধ। বাল্যকালে রোকেয়ার পিতা স্নেহপরবশ হয়ে কন্যাকে একটু বাংলা পড়াতেন। কিন্তু তা বেশী দূর অগ্রসর হয়নি।

www.pathagar.com

রোকেয়ার জ্ঞান-পিপাসা ছিল অসীম। তাই সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে গভীর রাত্রে মোমবাতির আলোয় তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট বিদ্যাভ্যাস করতেন।

রোকেয়ার দুই ভাই এবং অপর দু'টি বোন ছিল। ভাই ইবরাহীম সাবির ও খলীল সাবির ইংরেজী শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং জ্যেষ্ঠা ভগ্নি করিমুন্নেছার উৎসাহ ও সহায়তায় সেই অবরোধপুরীতেও রোকেয়া বাংলা এবং ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পান। দিনের পর দিন নিভৃত সাধনা চলতে থাকে।

ক্রমে রোকেয়া যৌবনের সীমায় পদার্পণ করেন। যথাসময়ে সুশিক্ষিত চরিত্রবান খান বাহাদুর সাখাওয়াৎ হোসেনের সংগে রোকেয়ার বিবাহ হয়। এ যেন সোনায় সোহাগা। বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরে সাখাওয়াৎ হোসেনের পৈত্রিক নিবাস। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, ন্যায়বান ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ।

রোকেয়া ছিলেন স্বামীভাগ্যে ভাগ্যবান। তাঁর ভিতরে যে বিপুল সম্ভাবনা লুক্কায়িত ছিল বিদ্যোৎসাহী স্বামীর সন্নিধানে তা প্রকাশ পেতে থাকে। সাখাওয়াৎ সাহেব ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে প্রতিভাময়ী স্ত্রীর জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করেন।

বিহারে অবস্থানকালে তিনি মুসলিম নারী সমাজের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা ভালভাবে অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছেন। এ সময়কার পরিস্থিতি সম্বন্ধে রোকেয়া লিখেছেন, "বিহার অঞ্চলে বিবাহের পূর্বে ছয় সাত মাস পর্যন্ত নির্জন কারাগারে রাখিয়া মেয়েকে আধমরা করা হয়। ঐ সময় মেয়ে মাটিতে পা রাখে না। প্রয়োজন মত তাহাকে কোলে করিয়া স্নানাগারে লইয়া যাওয়া হয়। সমস্ত দিন মাথা গুজিয়া একটি খাটিয়ার উপর বসিয়া থাকিতে হয়, রাত্রিকালে সেখানেই শুইতে হয়। অপরে মুখে তুলিয়া ভাতের গ্রাস খাওয়ায়। ১৯২৪ সনে নাতনীর বিবাহের নিমন্ত্রণে আমরা গিয়াছিলাম, বেচারী তখন বন্দীখানায়। আমি সেই জেলখানায়

www.pathagar.com

গিয়া বেশীক্ষণ বসিতে পারি নাই। সে রুদ্ধ গৃহে আমার দম আটকাইয়া আসে। বেচারী ছয় মাস সেই রুদ্ধ কারাগারে ছিল, শেষে তাহার হিষ্টিরিয়া উৎপত্তি হইল।" এসব অমানুষিক কাণ্ড রোকেয়াকে ব্যাকুল করে তোলে। ভাবলেন, এর মুক্তি কোথায়। পাতালপুরীর দুঃখিনী রাজকন্যাকে উদ্ধারের কি কোন পথ নেই? রোকেয়া মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন। না, এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না। রোকেয়া মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হলেন, এ অমানুষিক যাতনাময় বন্ধনদশা মোচন করতেই হবে।

স্বামীর সঙ্গে তিনি নানা পরামর্শ করতেন। বিচক্ষণ স্বামী গভীর মনোনিবেশ সহকারে রোকেয়ার গতিপথ নির্দেশ করতেন। নানা উৎসাহের মাধ্যমে তিনি স্ত্রীকে পরোপকার ব্রতে উদ্বোধিত করতেন। রোকেয়ার পর পর দুটি সন্তান জন্মলাভ করে মারা যায়, সুতরাং ঘরের মায়াপাশ তাঁকে জড়াতে পারেনি। অষ্টপ্রহর তিনি মুসলিম মহিলার মুক্তি-কামনায় নিয়োজিত থাকেন! এরই মধ্যে সাখাওয়াৎ হোসেন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। সেবাযত্নে তিনি স্বামীর রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিতেন। নিজের আহার-নিদ্রার কথা ভুলে গেলেন। চতুর্দিকে তিনি ঘোর অন্ধকার দেখতে পেলেন। হীরার টুকরা স্বামী রোগশয্যায়। নানা দুর্ভাবনায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। একবার তখনকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে রোকেয়া লিখেছিলেন: "আমার মত দুর্ভাগিনী অপদার্থ বোধ হয় এ দুনিয়ায় আর একটা জন্মায়নি। শৈশবে বাপের আদর পাইনি। বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ urine পরীক্ষা করেছি। পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি, দুবার মা হয়েছিলুম—তাদেরও প্রাণভরে কোলে নিতে পারিনি। একজন ৫ মাসে, একজন ৪ মাস বয়সে চলে গেছে।"

ক্রমে রোকেয়ার স্বামীর অবস্থা অবনতির দিকে যেতে থাকে। সাখাওয়াৎ সাহেব বুঝতে পারলেন তাঁর জীবনের আশা নেই। তাই তিনি স্ত্রীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত করে দেওয়া সমীচীন মনে করলেন। তিনি তাঁর জীবনের সঞ্চিত সত্তর হাজার টাকা হতে দশ হাজার টাকা

www.pathagar.com

তাঁদের পরিকল্পিত মুসলিম মহিলা বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক করে দেন। অবশেষে ১৯০৯ খৃঃ ৩রা মে সাখাওয়াৎ হোসেন কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রোকেয়ার দাম্পত্য জীবন মাত্র দশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। স্বামী, পুত্র-কন্যা বিবর্জিত সংসারে আজ তিনি একা। সকল দায়িত্ব হতে তিনি মুক্ত। এবার সামনে বৃহৎ কার্যক্ষেত্র হতে তিনি আহ্বান শুনতে পেলেন। আর ঘরে বসে থাকা চলবে না, বাংলার মুসলিম নারী সমাজ ছলছল নয়নে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। তাঁদের সে দুর্বার আহ্বানে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিজের আরব্ধ পথে। স্বামীর শেষ স্বপ্নকে সফল করতে হবে। বাংলার মুসলিম নারীর দুঃখ ঘোচাতে হবে।

অন্তরে বিরাট আশা নিয়ে ১৯০৯ সালের ১লা অক্টোবর তিনি মোট পাঁচটি মেয়ে নিয়ে ভাগলপুরে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। এক বছর পর ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভাগলপুর হতে কলকাতায় স্কুল স্থানান্তর করেন। মাত্র আটটি ছাত্রী ও দুটি বেঞ্চ নিয়ে তিনি কলকাতার একটি গলিতে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল স্থানান্তর করেন। স্কুল পরিচালনার জন্য একটি সাহায্য কমিটিও গঠিত হল।

মৎস্য ও পানির মধ্যে যে সম্পর্ক, রোকেয়া এবং তাঁর স্কুলের সংগে সম্পর্ক ছিল ঠিক তাই। স্কুলের উন্নতি বিধানকল্পে তিনি মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। আরাম তিনি হারাম করলেন। কিন্তু পদে পদে বাধা। স্কুল পরিচালনার কাজে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি কলকাতার বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়ে গমন করে প্রত্যক্ষভাবে তথাকার কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা নিজ স্কুলে প্রয়োগ করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী তাঁর ছিল না। এজন্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে বাধা আসে, কিন্তু রোকেয়ার জ্ঞানের গভীরতা ছিল ব্যাপক। ডিগ্রীধারীদের চেয়েও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পেয়ে কর্তৃপক্ষ আনন্দিত হন। তখনকার দিনে মহিলা

www.pathagar.com

শিক্ষক পাওয়া ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। বেগম রোকেয়াকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হতে তাঁর স্কুলের জন্য শিক্ষয়িত্রী আনয়ন করতে হয়েছিল। এ সময় স্কুলের দশ হাজার টাকা ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ায় রাখা হয়েছিল। ব্যাংক ফেল পড়ায় দশ হাজার টাকা বরবাদ হয়ে যায়। সবাই নিরাশায় ভেঙে পড়ল। কিন্তু রোকেয়া নিজের তহবিল থেকে উক্ত টাকা পূরণ করেন। স্কুলের অন্যান্য প্রয়োজনে তাঁকে আরও বিশ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। এসব টাকা না হলে স্কুল অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যেত।

কিন্তু রোকেয়ার এ ঐকান্তিক সাধনা সমাজে প্রশংসা লাভ করা দূরে থাকুক, বরং চতুর্দিক থেকে তাঁর উপর নিন্দার ঝর বয়ে গেল। কেউ কেউ বলে বেড়াতে লাগল, রূপসী বিধবা রূপ যৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করে বেড়াচ্ছে। সংবাদপত্রের বিরোধিতা, মোল্লাদের ফতোয়া শিলাবৃষ্টির মত আপতিত হতে থাকে। কথায় বলে যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর। পেচক সূর্যালোককে ভয় পায়, অন্ধকারকেই সে ভালবাসে। তেমনিভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজ যেন স্ত্রীশিক্ষার আলোক সহ্য করতে পারছিল না

সমাজের নিন্দা-গ্লানির প্রসংগে রোকেয়া লিখেছিলেন, "এই যে হাড়-ভাঙা গাধার খাটুনী, ইহার বিনিময় কি জানিস? বিনিময় হইতেছে ভাঁড় লিপকে হাত কালা অর্থাৎ উনুন লেপন করিলে উনুন তো পরিষ্কার হয় কিন্তু যে লেপন করে তাহারই হাত কালিতে কালো হইয়া যায়। আমার হাড়ভাঙা খাটুনীর পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুল-ভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর।"

স্কুলে ছাত্রীদের যাতায়াতের ব্যাপার ছিল এক সমস্যা। পর্দার জন্য গাড়ীতে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে না পারলে ছাত্রীদের অনেকে বমি করত, অনেকের মাথা ধরত, ফলে এ ব্যবস্থায় অভিভাবকেরা মেয়েকে স্কুলে পাঠাবেন না বলে হুমকি দিত। আবার গাড়ীর দরজা সামান্য ফাঁক করে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করলেও চতুর্দিক থেকে 'জাত গেল, ধর্ম গেল' বলে

www.pathagar.com

চিৎকার উঠত। এ যেন শাঁখের করাত ; উভয় দিকেই কাটে। মংগলদাত্রী রোকেয়া শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্বদিক রক্ষা করে চলতেন। কিন্তু তবুও তাঁর দুর্নামের অভাব ছিল না। রোকেয়া বলেছেন, "আমি কারসিয়াং ও মধুপুরে বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়া, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগর-তীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের, বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের পঁচিশ বছর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠ-মোল্লাদের অভিসম্পাৎ কুড়াইয়াছি।" এতদসত্ত্বেও তিনি মুহূর্তের জন্য স্বীয় কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হন নাই। মাকড়সা যেমন নিজের জীবন দিয়ে অজস্র সন্তানের প্রাণরক্ষা করে তেমনি রোকেয়া তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করে বাংলার মৃতপ্রায় মুসলিম নারী সমাজে জীবনের সঞ্চার করেছিলেন। ধীরে ধীরে শত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে তাঁর স্কুল উন্নতির পথে ধাবিত হয়। তাঁর স্কুল হাইস্কুলে উন্নীত হয়। স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা দুইশতের সীমা ছাড়িয়ে যায়। রোকেয়ার কর্মসাধনা চারিদিকে আলোড়নের সৃষ্টি করে। বড়লাটপত্নী লেডী চেমসফোর্ড তাঁর স্কুল পরিদর্শনে আসেন। সরোজিনী নাইডু, শেরে বাংলা, স্যার আবদুর রহিম প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। মওলানা মুহম্মদ আলীর কন্যা বেগম রোকেয়ার কলেজেরই ছাত্রী। এভাবে অক্লান্ত সাধনার ফলে বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীর হৃদয়ে জ্ঞানশিখা জ্বালিয়ে তোলেন।

রোকেয়া শুধু স্কুলের কাজেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন নি। মুসলমান নারীর সামগ্রিক কল্যাণের জন্য তিনি বিভিন্ন উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বা 'মুসলিম মহিলা সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান মেয়েদের নানাভাবে জাগিয়ে তোলার ব্রত নিয়ে ইহা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কত দুঃস্থ মহিলা যে এ সমিতির দ্বারা উপকৃত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় যে আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলিম মহিলাদের প্রতিনিধি হিসাবে

www.pathagar.com

যোগদান করেন এবং প্রশংসনীয় কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। ক্রমে রোকেয়ার স্বাস্থ্য ভেংগে পড়ে। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর রোকেয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সারাজীবন হারভাঙা খাটুনীর পর এবার যেন তিনি বিশ্রাম নিলেন। কলকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে কলকাতার আলবার্ট হল এবং সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। তাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মহিলা যোগদান করেছিলেন। সে অপূর্ব দৃশ্য প্রমাণ করল, রোকেয়ার সাধনা বৃথা যায়নি। যে প্রদীপ তিনি জ্বেলেছিলেন তা লক্ষ মনে সঞ্চারিত হয়ে দীপালী উৎসবে পরিণত হয়েছে।

রোকেয়ার প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর দান অপরিসীম। বেগম শামছুন্নাহার মাহমুদ বলেছেন, "সুদূর অতীতে যে সকল মুষ্টিমেয় মুসলমান বাংলা সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, রোকেয়া তাঁহাদের একজন।"

বিশেষত রোকেয়া তাঁর সাহিত্যে অবরুদ্ধ মুসলিম নারীদের দুঃখ দুর্দশার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তার প্রতিবিধানের জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। রোকেয়া বাল্যকালেই জ্যৈষ্ঠা ভগ্নি করিমুন্নেছার প্রভাবে সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। উৎসাহ ও প্রতিভার সম্মিলনে পরবর্তীকালে তাঁর লেখনীতে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

রোকেয়া 'মতিচুর' ১ম ও ২য় খণ্ড, 'পদ্মরাগ,' 'অবরোধবাসিনী,' 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি 'মুক্তিফল' নামে সুবিখ্যাত প্রবন্ধ রচনা করেন।

'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে মুসলিম নারী সমাজের অবরোধ প্রথা ও লাঞ্ছনার কথা জীবন্ত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত নারীমুক্তি আসতে পারে না—এ সত্যই তিনি তুলে ধরেছেন 'পদ্মরাগ' গ্রন্থে।

'মুক্তিফল' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন নারীর সহায়তা ব্যতীত পুরুষ জাতির পক্ষে দেশের স্বাধীনতা আনয়ন করা সম্ভবপর নহে।

www.pathagar.com

'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থে তিনি এক অপূর্ব নারী রাজত্বের ছবি তুলে ধরেছেন, যে রাজ্যের কর্ণধার থেকে আরম্ভ করে সকল স্তরের কর্মচারীই নারী। পুরুষেরা সেখানে গৃহবন্দী। পুরুষ শাসিত রাজ্যের চাইতে নারী শাসিত রাজ্য অনেক বেশী সুখের ও শৃংখলাবদ্ধ, এ কথা তিনি উক্ত গ্রন্থে দেখিয়েছেন।

রোকেয়ার রচিত সাহিত্য নারী সমাজের এক অপূর্ব প্রেরণার উৎস। তাঁর ভাব ভাষা এবং বাচনভংগী প্রাণবন্ত এবং মনোরম। বেগম শামছুন্নাহার মাহমুদ বলেছেন, "রোকেয়ার সাহিত্যের বিশেষত্ব তাঁহার সহজ সরল তীক্ষ্ণ ও জোরালো ভাষা। সে যুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে এরূপ সরল, সুন্দর, প্রাণস্পর্শী, আন্তরিকতা ও সজীবতাপূর্ণ রচনাভংগি আর কাহারও আছে কিনা বলিতে পারি না। সর্বত্রই তিনি যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন এবং সকল সময়েই অকাট্য যুক্তি দ্বারা নিজের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

নিম্নলিখিত কবিতাটি থেকে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় মিলবে :

নিঠুর নিদয় শশি সুদুর গগনে বসি
কি দেখিছ ? জগতের হিংসা পাপরাশি ?
মোরে দেখে পায় তব হাসি ?
যখন তাপিত প্রাণে—চাহি তব মুখ পানে
তোমার এ হাসি দেখে হিংসা হয় চিতে।
আমি যেন পারি না হাসিতে ?
জগতের দুঃখ ভয় তোমাদের সংগী নয়
পাপ তাপ তোমাদের কাছে নাহি যায়
তারা কেন আমারে কাঁদায়
তুমি নিলীমার দেশে যথা ইচ্ছা যাও ভেসে
অনন্ত আকাশ যেন তোমারি আলয়।
আমি কেন পাই না আশ্রয়।

বেগম রোকেয়ার জীবনের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সাধনার অমৃত ফল আজকের এই মুসলিম নারী সমাজ। তিনি ছিলেন নারী আন্দোলনের

www.pathagar.com

অগ্রদূতী। নীলকণ্ঠের মত সমগ্র বেদনা সহ্য করে তিনি হাসিমুখে কল্যাণ পথের বন্ধদুয়ারের অর্গল খুলে দিয়েছেন। জীবনের সর্বশক্তি তিনি সমাজের কাজে ব্যয় করেছেন। কখনও দুঃখ, কখনও অভিমানে ও ক্ষোভে তিনি অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু সবই সমাজের কল্যাণে। একবার তিনি বলেছিলেন, "আলীগড়ের মেয়ে কলেজে শীঘ্রই দশ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া নারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবে। আর আমাদের বাংলাদেশ আহা রে! সে কথা না বলাই ভাল, আমি যদি কিছু টাকা পাইতাম তবে কিছু করিয়া দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে টাকা দেন নাই।"

বলি, আমার বাংলাদেশ, যদি কিছু নাই করিস, তবে দড়ি ও কলসীর সাহায্যে তোর অস্তিত্ব লোপ করিতে পারিস তো। সেজন্য আর ভাবনা নাই, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর সে ভার লইয়াছে। আহা বুক ফাটিয়া যাইতে চায়।"

স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কতখানি ভালবাসা থাকলে এরূপে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করা যায় তাহাই অনুমেয়।

'প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য বিদ্যাশিক্ষা ফরয'—পবিত্র কুরআনের এ বাণীকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি এক পত্রে লিখেছেন, "বেহেশতের নিমন্ত্রণ পেলেও তো স্কুল ছেড়ে যেতে পারব না।" পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম উৎসর্গকৃত প্রাণ মহিলা আর কয়টি মিলবে?

বেগম রোকেয়ার চরিত্রে ছিল কোমল কঠোরের অপূর্ব সমাবেশ। পরের দুঃখে তাঁর অন্তর হত বিগলিত। তাই সমাজে নারীর হীনাবস্থা দেখে তাঁর অন্তর হত বিগলিত। তাই সমাজে নারীর হীনাবস্থা দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। এ বন্ধনদশা মোচন করার জন্য তিনি যে বাস্তব পথ বেছে নিলেন, সে পথে ছিল বিস্তর বাধা। সে বাধা অতিক্রম করতে তিনি যে বলিষ্ঠতার প্রমাণ দিয়েছিলেন তা তুলনারহিত।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মীয় অনুশাসনের ভয়, সমাজের ভয়, নিন্দা শ্লেষ সবকিছু তিনি উপেক্ষা

www.pathagar.com

করতে পেরেছিলেন, এ তাঁর দুর্জয় সাহসের পরিচায়ক। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"—এই ছিল তাঁর পণ। নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যে তিনি অর্থ, স্বার্থ, আত্মীয়স্বজন সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি শুধু সমাজের ঘা খেয়ে নীরব থাকেন নি। সুযোগমত সমাজকেও আঘাত করেছেন গোঁড়ামী ও অন্ধত্বের জন্য তীব্র শ্লেষ ও উক্তির মাধ্যমে। তিনি বলতেন, "ভ্রাতৃগণ! মনে করেন, তাহারা গোটা কতক আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামিয়া কলেজ জয় করিয়া পুলসিরাত পার হইবেন। আর সে সময় স্ত্রী-কন্যাকেও হ্যাণ্ডব্যাগে পুরিয়া পার করিয়া নিবেন।" তাঁর এ শ্লেষ তীব্র হলেও গঠনমূলক—যা চাবুক মেরে ত্রুটি নির্দেশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

সমাজ তাঁকে ধর্মদ্রোহিণী আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর সাধনা ধর্মের স্বপক্ষে। ইসলামকে তিনি পরিপূর্ণভাবে বুঝতেন। তাই তিনি একবার ধর্ম প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "নারিকেলের চমৎকার স্বাদ তাহার দুর্ভেদ্য আবরণের ভিতরে আবদ্ধ। অন্ধ মানুষ সেই কঠিন আবরণ ভেদ করিবার চেষ্টা না করিয়া সারাজীবন শুধু ত্বকের উপরিভাগটাই লেহন করে।" রোকেয়া ধর্মের উপরিভাগ ভেদ করে ভিতরের শ্বাস পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জনৈক সাহিত্যিক রোকেয়ার মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন, "মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে আরও ভাল করে অনুভব করলাম যে, মানুষের জীবন ঝড়ের মুখের প্রদীপ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে সান্ত্বনা ও গৌরবের এই যে, এ প্রদীপ ধোঁয়া দেয়নি কখনো; দিয়েছে শুধু আলো।"

বাস্তবিক তাই, রোকেয়া প্রদীপের সমস্ত ধোঁয়াটুকু নিজের বুকে গ্রহণ করে সমাজের হাতে মঙ্গল আলোক তুলে দিয়েছিলেন। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে বাংলার মুসলিম নারী সমাজের একটি মহিলাও যদি ইতিহাসে স্থান পান, তবে তিনি বেগম রোকেয়া ভিন্ন আর কেউ নন।

———

I F P—80·81—P 2574—5250—1·10·1980

www.pathagar.com